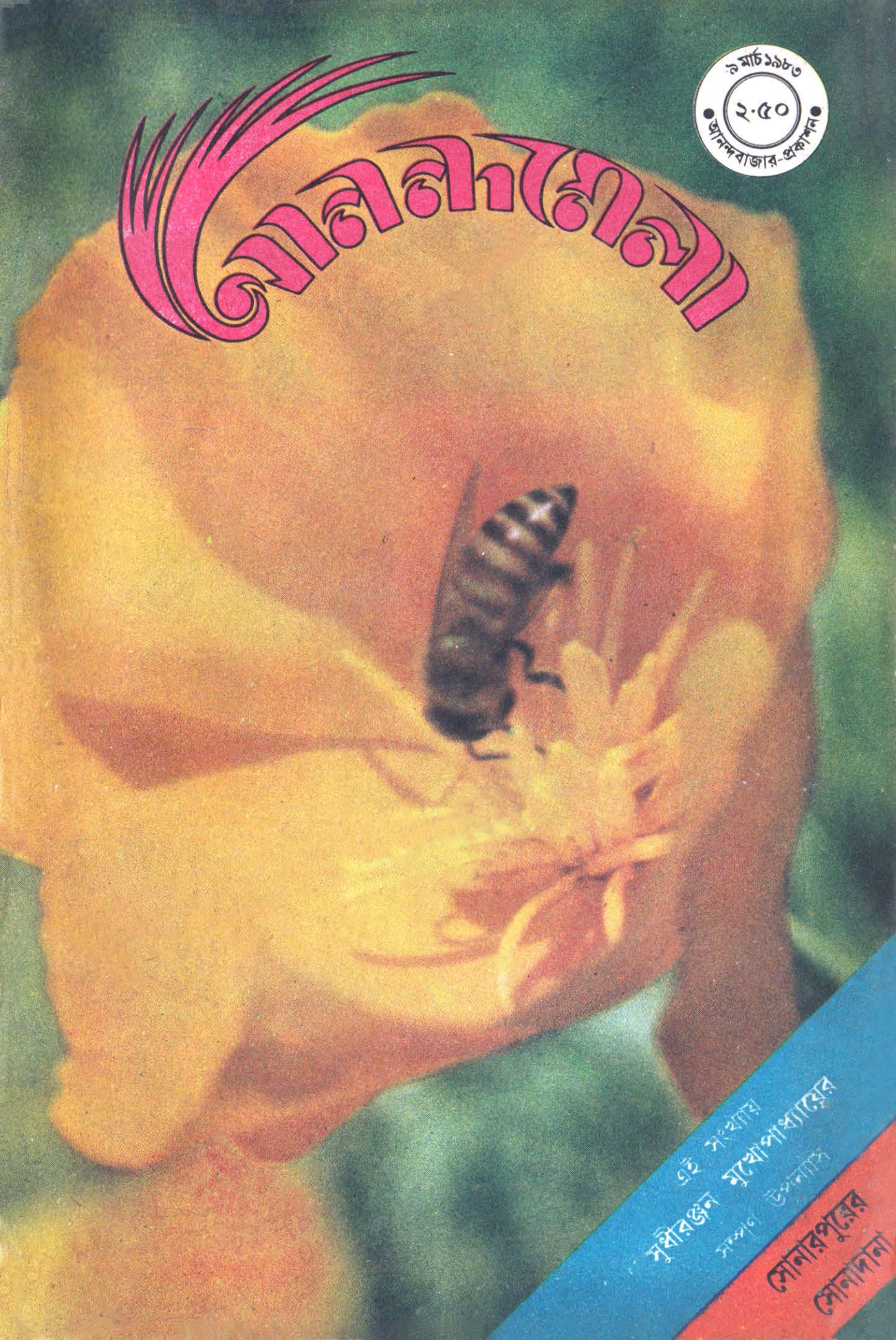
আনন্দমেলা
৯ মার্চ ১৯৮৩
২·৫০
আনন্দবাজার-প্রকাশন
এই সংখ্যায়
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের
সম্পূর্ণ উপন্যাস
সোনারপুরের সোনাদানা

ধু লো খে লা
অতীতের সাগর সেঁচে মনি মানিক্যের সন্ধান
Please visit : http://dhulokhela.blogspot.in/
পড়ুন ও আমাদের
সংরক্ষনে সাহায্য করুন

LINTAS-SU-253-1812 BG

হিন্দুস্থান লিভার-এর একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

মর্টনের
কোকোনাট কুকিজ
'থ্রী-ইন-ওয়ান'
টফি এসে গেছে !
উপরটা মুচ্‌মুচে মল্টযুক্ত ল্যাকটোবন্‌বন্‌
দিয়ে ঢাকা, ভেতরটা নরম মাখনের
মতন—মুখের মধ্যেই গলে যায়। আর
সবশেষে আছে নারকেল গুঁড়োর
স্বাদ। এই তিন স্বাদে ভরা এ
টফির জবাব নেই !
MORTON
SWEETS OF DISTINCTION
মর্টন কনফেক্‌শনারী
এন্ড মিল্ক প্রোডাক্টস ফ্যাক্টরী
পো: মাঢ়ৌরা (জিলা : সারন) বিহার

CC/M-6/81 BEN

শেষ হয়ে আসে ফাল্গুন মাস,
রেল-লাইনের পাশে
সে আঁকে নবীন প্রাণের আভাস
পলাশের উচ্ছ্বাসে ।
জ্যোৎস্নার শাল শরীরে জড়ায়
রাত্রে চাঁদের বুড়ি,
দক্ষিণা বায়ে পাপড়ি ছড়ায়
বিমুগ্ধ বেলকুঁড়ি ।

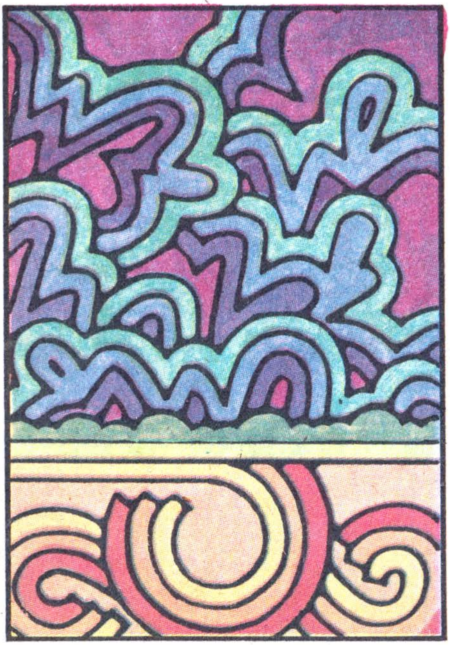

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড, কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত । দাম দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

আনন্দমেলা

২৪ ফাল্গুন ১৩৮৯ ● ৯ মার্চ ১৯৮৩
৮ বর্ষ ● ২৪ সংখ্যা

সম্পূর্ণ উপন্যাস

সোনারপুরের সোনাদানা ।
সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায় ৫০

গল্প

ভূতু-ভূতু, ভূঁতি-ভূতি । বলরাম বসাক ১০
শুভ্রদীপের বুদ্ধি । রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় ১৪
বিচিত্র চোর । তুলসী সেনগুপ্ত ২৭

ছড়া

ছড়ার প্রাণী । সন্তোষ চক্রবর্তী ২৬
কেরামতি । কালিদাস ভট্টাচার্য ৪৯

ধারাবাহিক উপন্যাস

জঙ্গলগড়ের চাবি । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ১৯
রুআহা । বুদ্ধদেব গুহ ৪৫

স্মৃতিকথা

উইং থেকে গোল । পি· কে· ২৪
বসু-বাড়ি । শিশিরকুমার বসু ৩১

দেশ-বিদেশের কথা

…টিউলিপ উৎসব । সুশীল চৌধুরী ৬
লণ্ডনের লঙ্কাকাণ্ড । আরতি দাস ৪০

কমিক্স, ধাঁধা, শব্দসন্ধান, লেখাপড়া,
খেলাধুলো, বিজ্ঞান-বিচিত্রা ইত্যাদি

প্রচ্ছদচিত্র : রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস

আগামী সংখ্যায়

আশাপূর্ণা দেবীর
সম্পূর্ণ উপন্যাস
লঙ্কা মরিচ ও এক
মহামানব

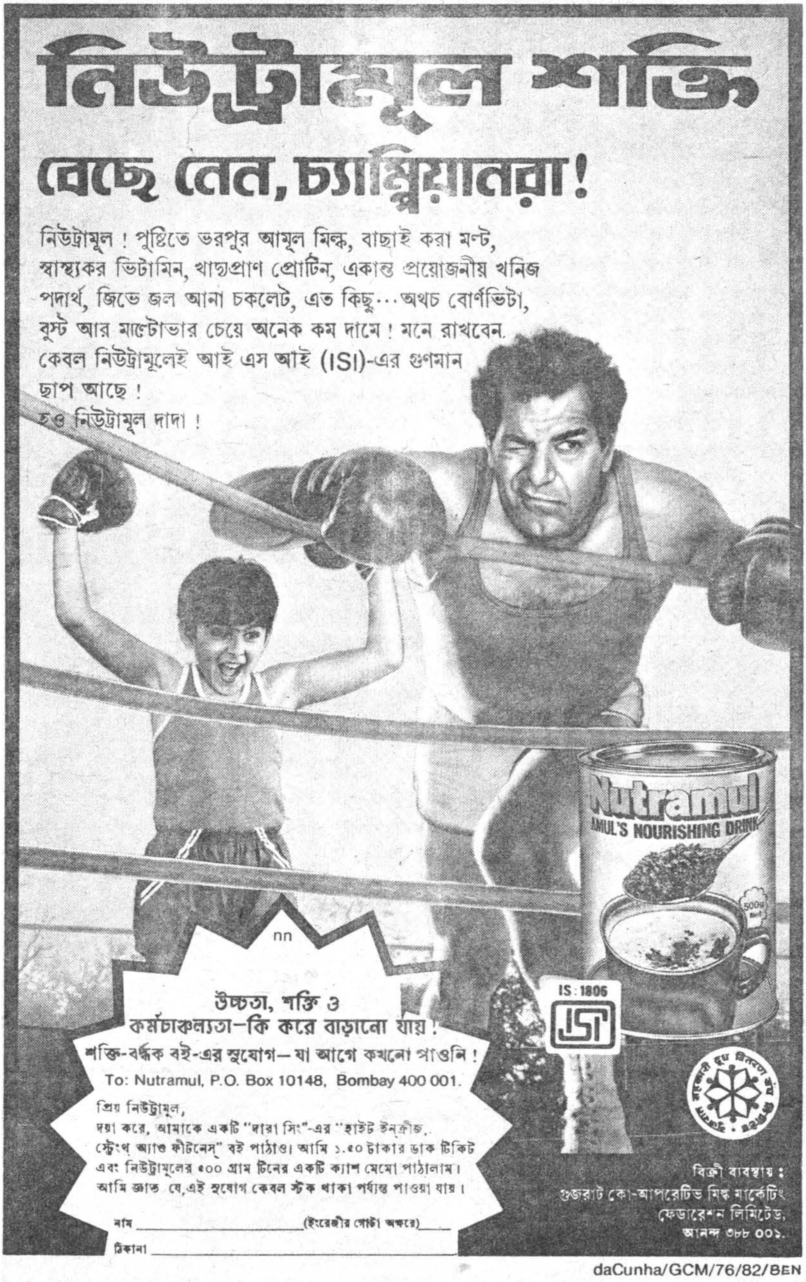

daCunha/GCM/76/82/BEN

অশোককুমার সরকারের জীবনাবসান

প্রখ্যাত সাংবাদিক, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নির্ভীক কর্মী এবং আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রধান সম্পাদক অশোককুমার সরকারের আকস্মিক প্রয়াণে আমরা গভীরভাবে শোকাহত। অশোকবাবু 'মাসিক আনন্দমেলা'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, তাঁর সুদক্ষ সম্পাদনায় এই পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বিপুলসংখ্যক পাঠকের ভালবাসা অর্জন করে। জীবনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত তিনি ছিলেন আনন্দমেলার মনোযোগী পাঠক ও শুভানুধ্যায়ী। তাঁর অকাল প্রস্থানে যে ক্ষতি হল, তা অপূরণীয়।

আদর্শবাদী এই মানুষটি ছোটদের ভালবাসতেন। তিনি চাইতেন, শিশু-প্রতিভার পূর্ণবিকাশ হোক। এই বিকাশের কাজে তিনি গঠনমূলক নানা উদ্যোগ নিয়েছিলেন, যার একটি হল আনন্দমেলার প্রকাশ। কর্মযোগী অশোকবাবু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করে গেছেন। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় কলকাতার বইমেলায় একটি বইয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করার সময় তিনি অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। আমরা তাঁর আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

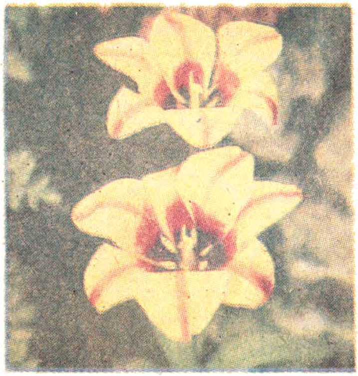

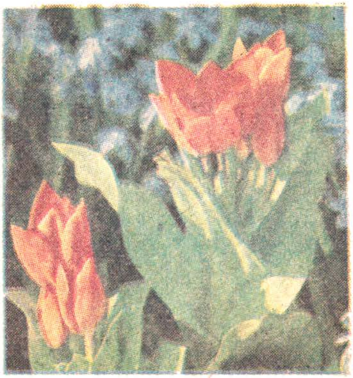

হল্যাণ্ডের টিউলিপ-উৎসব

সুশীল চৌধুরী

ছোট্ট দেশ হল্যাণ্ড, য়ার বেশির ভাগটাই ডাচরা 'নর্থ সী'-র গ্রাস থেকে উদ্ধার করেছেন। সমুদ্রের সঙ্গে যুঝেই বোধহয় ডাচরা হয়ে উঠেছিলেন পৃথিবীর অন্যতম সেরা অভিযাত্রী। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় শুরু থেকেই পর্তুগিজ ইংরেজ প্রভৃতি জাতির মতো ডাচরাও ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন বন্দরে বাণিজ্য শুরু করে দেন। এঁদের মধ্যে ডাচরাই বাংলার সঙ্গে প্রথম ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করেন। ডাচরা বাণিজ্যের জন্য চুঁচুড়াতে কুঠি স্থাপন করেন সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। তারপরে এ-দেশে আসেন ইংরেজরা, হুগলিতে কুঠি তৈরি করেন। সর্বশেষে আসেন ফরাসি আর ডেনরা—সে এক অন্য ইতিহাস, অন্য গল্প।

এইসব ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য আমার গবেষণার বিষয়। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজের শুরুতেই আমাকে ডাচ ভাষা শিখতে হল। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা! গবেষণা করতে গেলেও আমি তখন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অথচ ডাচ ভাষা শেখার জন্য আমাকে যেতে হল

এক মেয়েদের কলেজে। ক্লাসে আমিই একমাত্র ছেলে, বাকি সবাই মেয়ে। অধ্যাপিকা নিজে ডাচ—বিরাট চেহারা। আমার মতো ক্ষীণবপুর বঙ্গসন্তান তাঁর কাছে লিলিপুট। মহিলাকে মনে হত নির্দয়। রোজ পড়া দিতেন, রাত জেগে সে-সব পড়া তৈরি করতে হত। পরের দিন মহিলা যে শুধু পড়া জিজ্ঞেস করতেন তা নয়, বোর্ডে গিয়ে লিখতেও বলতেন। আর ক্লাসে যে শুধু আমিই একমাত্র ছেলে, আমাকেই মহিলা বেশি করে লিখতে বলতেন। কিছু ভুল হলে ক্লাসের মেয়েরা হো-হো করে হেসে উঠত—সুতরাং সর্বক্ষণ ভয়ে তটস্থ থাকতে হত। কোনোরকমে একটি বছর ঐ যন্ত্রণার মধ্যে কাটিয়ে গঙ্গাস্নান করার যোগাড় আমার!

এ-সবই সহ্য করতাম, কারণ কোনোরকমে ডাচ ভাষা কিছুটা পড়তে পারলে হল্যাণ্ডে গিয়ে কাজ করতে পারব। হল্যাণ্ডের কথা ভাবলেই ভেসে উঠত

উইণ্ডমিলের ছবি। তাছাড়া ওদেশের চিজ আর টিউলিপ ফুল তো বিশ্ববিখ্যাত। ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজ দেখতে দেখতে ক্লান্ত হলে চলে যেতে পারব এদিক-ওদিক—ক্রিসক্রস করে পুরো দেশটা ঘুরতে সময় খুব বেশি লাগে না। রাজধানী দ্যোন হাগ বা দি হেগ থেকে হল্যাণ্ডের যে কোনো জায়গায় সকালে গিয়ে বিকেলে ফিরে আসা যায়—এত সুন্দর ট্রেন বা বাসের ব্যবস্থা। আমার গবেষণার নথিপত্র যে মহাফেজখানায় সেটা হেগ শহরেই। সুতরাং লণ্ডন থেকে একদিন চলে এলাম উড়ে—সময় লাগল ঘণ্টাখানেকেরও কম। ট্রেনে এলে সময় লাগত বেশি অথচ ভাড়া প্রায় সমান। ছাত্র বলে প্লেনের ভাড়া অনেক কম। ইউরোপের ছাত্র ইউনিয়নগুলো ছুটির সময় ছাত্রদের যাতায়াতের জন্য পুরো প্লেন চার্টার করে নেয়—তাতে ভাড়া খুব কমই লাগে। ফলে ছাত্ররা সাধারণত প্লেনেই যাওয়া-আসা করে।

আন্তর্জাতিক ছাত্রাবাসে আমার থাকার ব্যবস্থা। অপূর্ব বাড়িটি, এবং তার বাগান। এটাই আগে রাজপ্রাসাদ ছিল। এখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোকজনের সঙ্গে আলাপ হল—সবাই পড়াশুনো করতে এসেছেন হল্যাণ্ডে। যথারীতি বঙ্গসন্তানদেরও অভাব হল না। একদিন বাংলাদেশের এক ভদ্রলোক প্রস্তাব করলেন টিউলিপ-উৎসব দেখতে যাবার জন্য। আমার এক ডাচ অধ্যাপক বন্ধু এরই মধ্যে আমাকে আমস্টারডাম, রটারডাম ঘুরিয়ে এনেছেন। এ দুটোই হল্যাণ্ডের বড় শহর—দুটোই বন্দর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দুটো শহরই, বিশেষ করে রটারডাম, একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। তাই রটারডামের বেশির ভাগ বাড়িই নতুন। ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর বলে এখানে এক নতুন টাওয়ার তৈরি করা হয়েছে—যার নাম 'ইউরোমাস্ট' বা ইউরোপের মাস্তুল। এর সবচেয়ে ওপরের তলায় ঘূর্ণ্যমান রেস্তোরাঁ, সেখানে বসে খেতে খেতে পুরো রটারডাম শহর দেখার মতো মজা খুব কমই আছে। অবশ্য উচ্চতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খাবারের দামও প্রায় আকাশছোঁয়া।

ডাচরা খুবই অতিথিবৎসল। আমার ডাচবন্ধু আমাকে একটা পয়সাও খরচ করতে দিলেন না। যতবারই পয়সা দিতে গিয়েছি, ততবারই ভদ্রলোক প্রবল বাধা দিয়ে একই কথা বলেছেন, "তুমি আমার অতিথি, সব খরচ আমার।"

ভেনিসের সঙ্গে আমস্টারডামের বেশ মিল আছে। ভেনিসের মতো এখানেও শহরের ভেতর দিয়ে অসংখ্য খাল চলে গেছে। সেই সব খাল দিয়ে ট্যুরিস্টদের নিয়ে অসংখ্য মোটর-বোট সারাদিন ঘুরে বেড়ায়। এককালে এসব খালই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান জলপথ।

অধ্যাপক-বন্ধুও কথাপ্রসঙ্গে বললেন, টিউলিপ-উৎসব হল্যাণ্ডের প্রায় জাতীয় উৎসবের মতো। সুতরাং ওটা দেখা অবশ্য কর্তব্য। এরই মধ্যে লক্ষ করেছি, ডাচরা জাতি হিসেবে কী অসম্ভব ফুল ভালবাসে। রাস্তার ধারে-ধারে অসংখ্য রঙ-বেরঙের ফুল—এমনকী বাজারের রাস্তাতেও ফুলের টবে অপূর্ব সব ফুল। সরু গলির মধ্যে দুপাশের বাড়ির সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঝোলানো কাঠের বাক্সে ফুলের গাছ। আর টিউলিপের তো কথাই নেই। টিউলিপ ডাচদের জাতীয় ফুল। যত্রতত্র তার ছড়াছড়ি। উৎসব হবে কিউকেনহফে—হেগ থেকে ঘণ্টা দুয়েকের মতো সময় লাগে বাসে। সুতরাং যেদিন উৎসবের শুরু সেদিনই দুই বঙ্গসন্তান—আমি আর তাহেরসাহেব বেরিয়ে পড়লাম।

ঝকঝকে দিন—এপ্রিল মাসের প্রথমদিকের নরম সোনা রোদে চারদিক ঝলমল করছে। সবুজ প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে বাস ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে উইণ্ডমিল

চোখে পড়ছে। আজকাল এগুলো শুধুমাত্র দর্শনীয় বস্তু হিসেবে আছে, প্রায় সবগুলোই অকেজো। অথচ একসময়ে উইণ্ডমিলই ছিল হল্যাণ্ডের গ্রামগুলোর প্রধান প্রাণশক্তি। এগুলো দিয়ে জল তোলা হত, সেচের কাজে জল যোগান হত, গম এবং অন্যান্য শস্য ভাঙানো হত। অথচ এই উইণ্ডমিলগুলো চালাতে খরচ কিছু ছিল না—হাওয়াতেই চলত এগুলো। মাঠের মধ্য দিয়ে যেতে যেতে দেখলাম, অনেক নধরকান্তি গোরু চরে বেড়াচ্ছে। কোথাও বা গ্রামের গোয়ালা কাঠের জুতো পরে চিজ, মাখন তৈরি করতে ব্যস্ত। সবচেয়ে ভাল লাগছিল গাঢ় সবুজের মেলা, যা দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল।

কিউকেনহফের টিউলিপ উৎসবকে বলা হয় "দি গ্রেটেস্ট ফ্লাওয়ার-শো অন আর্থ"—পৃথিবীর বৃহত্তম পুষ্প-প্রদর্শনী। এতে বোধহয় কোন অত্যুক্তি নেই। পৃথিবীর অনেক জায়গা ঘুরেছি, এত বড় ফুলের উৎসব কিন্তু কোথাও চোখে পড়েনি। যে-বাগানে এ-উৎসবের আয়োজন, সেটাকে বিরাট এক প্রান্তর বললেই হয়। সত্তর একর জমি জুড়ে বাগান আর তাতে লক্ষ-লক্ষ টিউলিপ। যেন ফুলের এক বিরাট জলসা। কয়েকশো বছরের পুরনো গাছ আছে সে বাগানে আর নানা ফুলের ঝোপ-ঝাড়। ছোট-ছোট পুকুর ভর্তি লিলি। পাঁচ হাজার স্কোয়ার মিটারের একটি গ্রিনহাউস। তাছাড়া ছাদওয়ালা একটি বাগান। রানী জুলিয়ানা প্যাভিলিয়নে নানা ফুলের প্রদর্শনী। সব মিলে যেন এক স্বপ্ন-রাজ্য —ফুলের সে-রাজ্য—লাল, নীল, হলদে, সাদা নানা রঙের টিউলিপের অপরূপ এক সমারোহ।

বাস থামল সেই টিউলিপ-উদ্যানের গেটেই। যাত্রী বেশি নেই, আমাদের মতো কজন ছাড়া বেশির ভাগ লোকই গাড়িতে আসে এসব জায়গায়, না হয় ট্রেনে। কোচ বা বাসের যাত্রীর সংখ্যা খুব কম। গেট দিয়ে ঢুকতেই সহাস্যবদনা তিন ডাচ ললনা সনাতন ডাচ পোশাক পরে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এল।

প্রথমেই আমরা গেলাম গ্রিনহাউসে—টিউলিপগুলো বেডের মধ্যে ফুটে আছে আপন খুশিতে। বিরাট লম্বা আর চওড়া গ্রিনহাউসে হরেক রঙের টিউলিপ। অসংখ্য দর্শক দুধারে দাঁড়িয়ে সেই অপূর্ব দৃশ্য দেখছে। এত ফুল একসঙ্গে কখনও বোধহয় দেখিনি। লাল টিউলিপ ফুটে আছে, মাঝখানে পাপড়িগুলোকে দেখে মনে হয় যেন রঙিন প্রজাপতি উড়ে এসে বসেছে। সাদা টিউলিপ যেন শুভ্রতায় উন্নতশির। এত পবিত্র মনে হচ্ছিল যে, হাত দিয়ে ধরতে ভরসা হচ্ছিল না। একটু দূরে হলুদের মাতামাতি, সব হলদে রঙের টিউলিপ। প্রকৃতি কী খেয়ালে একই ফুলের এত রঙ করেছেন—এত রঙের বাহার দিয়েছেন, ভাবতে অবাক লাগে। কোথাও বা লাল, সাদা আর হলদে রঙ মিলে অসামান্য টিউলিপ। পৃথিবীর সব জায়গা থেকে লোক আসে টিউলিপ-উৎসব দেখতে। মাসাধিক কাল চলে এই উৎসব।

ভাবতে অবাক লাগে, টিউলিপ বাল্ব বিক্রি করে হল্যাণ্ড বছরে লক্ষ-লক্ষ বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে টিউলিপ ফুল রফতানি করেও হাজার-হাজার বিদেশী মুদ্রা আসে হল্যাণ্ডে। চিজ, মাখনের পরেই বোধহয় বিদেশী মুদ্রা অর্জনে টিউলিপের স্থান।

বিরাট প্রান্তর ঘুরে-ঘুরে টিউলিপের শোভা দেখতে একটুও ক্লান্তি আসছিল না। মাঝে মাঝেই রাস্তার ধারে সুন্দর বসার জায়গা—খাবার দোকান তো আছেই।

বেলা ফুরিয়ে এলে আমাদের পরিক্রমাও শেষ হল। এমন ফুলের মেলার স্মৃতি চিরদিন অক্ষয় থাকবে। টিউলিপের স্বপ্নরাজ্য ছেড়ে চলে আসার সময় খুব খারাপ লাগছিল।

ভূতু-ভূতু ভূতি-ভূতি

বলরাম বসাক

এক যে ছিল ভূত। তার নামটি ছিল ভূতু-ভূতু। তার যে ছিল বউ। তার নামটি ছিল ভূতি-ভূতি। সামুমামাদের চিলেকোঠার ভেন্টিলেটারে দুজন ঠাসাঠাসি করে বসত আর পা দোলাত। এক হাত লম্বা জিভ দিয়ে চেটে চেটে ললিপপ খেত আর গান গাইত—

ভূতু-ভূতু, ভূতি-ভূতি
চোখ দুটো পুঁতি পুঁতি
পরে লাল নীল জুতি
পরে টোপা কুল টুপি
চলে আসি চুপি চুপি।

"গানটা কখন গায়?"

"কেন রাত-দুপুরে। সেই তো যখন চাঁদামামা হাসি-হাসি মুখ করে মাঝে মাঝে জিভ বের করে ভেংচি কেটে দেয়, আর এই না দেখে কয়েতবেলগাছের হুতুম পেঁচা যখন থুম মেরে বসে থাকে, তখন চিনটুদের গোমড়ামুখো দেয়ালঘড়িটা করে কি, ড্যাং টিং টুং টাং ঢং; ড্যাং টিং টুং টাং ঢং আওয়াজ করে দেয়ালে ঝুলন্ত মানাদিদির গিটারের দিকে তাকিয়ে একটা ছোট্টমতন ভেংচি কেটে দেয়। বেচারা মানাদিদির গিটার কী আর করে! রেগেমেগে পটাং-পটাং করে তার ছিঁড়তে থাকে।

ঠিক সেই সময় ভূত আর ভূতের বউ—

ভূতু-ভূতু ভূতি-ভূতি
পরে লাল জুতি-টুতি
আর লাল টুপি-টুপি
নাচে মৃদু চুপি-চুপি।

"কোন্‌খানটায় নাচে?"

"কেন রান্নাঘরে। শুনতে পাও না মাঝে-মাঝে টুং-টাং শব্দ হচ্ছে। নাচতে গিয়ে পা লেগে যাচ্ছে বাটিতে, কখনো কাঁসিতে, কোনো সময় আবার গেলাসে, থালায়, কোনো সময় আবার চায়ের কাপে। নাচতে-নাচতে নাচতে-নাচতে ভীষণ খিদে পেয়ে যায়। খিদে পেলেই লম্বা-লম্বা ঠ্যাঙদুটো তখন বেঁটে হয়ে যায়। বেঁটে হয়ে গেলে খাটো খাটো হাত দুটো তখন লম্বা হয়ে যায়। তারপর লম্বা-লম্বা হাত দুটো মেলে—

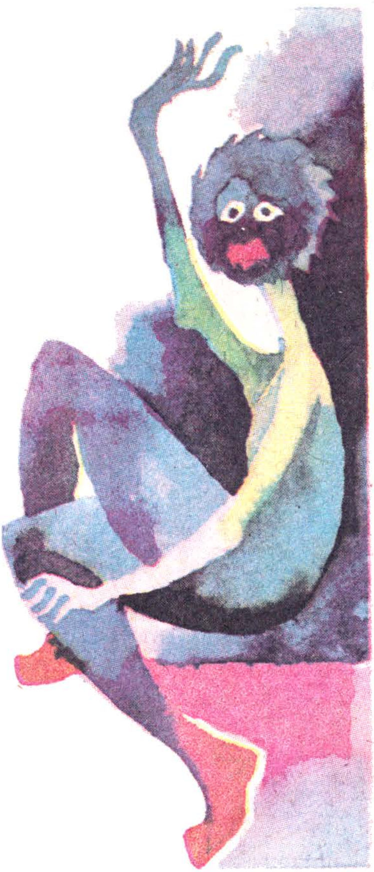

এদিকে এ হেলে ওদিকে ও হেলে
পাউরুটি আর জ্যাম জেলি পেলে
আর তার সাথে বিস্তর খাবার
মুগ মুসুরি বা কুকারের রাবার
মরিচের দিকে জিভ না চালিয়ে
দুধ, চা ও চিনি টুক করে নিয়ে
খায় গিলিগিলি হাসে খিলিখিলি
ভূতু-ভূতু সাথে ভূতি-ভূতি মিলি

সামুমামা বলল, "ওই ভূত আর ভূতের বউটাকে ধরতে হবে।" বাপ্ রে কী সাঙ্ঘাতিক কথা। ভূত আবার ধরে নাকি কেউ ? কিন্তু সামুমামা ধরবেই। করল কী, একটা বেশ বড় আর বড্ড ভারী একটা ইঁদুরের কল ভাল করে ঝেড়ে-মুছে তার ভেতর পাউরুটি জেলি মাখিয়ে রেখে দিল। তারপর কলটা রান্নাঘরে রেখে দিল। দাঁড়াও না বাপু। ভূতু-ভূতি এবার কোথায় যাবে। কাল রাতদুপুরে ভেনটিলেটারে এসে বসবে। বসে বসে গান গাইবে। তারপর দুটো বাজলে রান্নাঘরে নাচতে নাচতে ঢুকবে। তারপর নাচবে। নাচতে নাচতে খিদে পাবে। তারপর পা বেঁটে হবে। হাত লম্বা হবে। তারপর—

এদিকে এ হেলে ওদিকে ও হেলে
পাউরুটি আর জ্যাম জেলি পেলে

অমনি হাতটা বাড়িয়ে দেবে। তখন হাতটা কলের ভেতর ঢুকিয়ে দেবে। অমনি শব্দ হবে 'খপ্'। ব্যস। হাত যাবে আটকে। আর ভূতু পালাতে পারবে না। তারপর ভূতুকে ছেড়ে ভূতিও পালাতে পারবে না।

চিনটু কিন্তু সেদিন সারা রাত ঘুমোয়নি। লি এপাশ করেছে আর ওপাশ করেছে। সারাক্ষণ কান পেতে শুনেছে, ওই যে ঘড়িতে দুবার বাজল ড্যাং টিং টুং টাং ঢং। ঐ যে ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দ হল। মনে হয় ভেনটিলেটার থেকে লাফিয়ে নামল। ওই যে রান্নাঘরে শব্দ হচ্ছে টুং টাং। তার মানে নাচ হচ্ছে। নাচবার সময় বাটিতে গেলাসে পা ঠেকে যাচ্ছে। বোধহয় নাচছে, এখনো নাচছে। ইশ্, আর কতক্ষণ ধরে নাচবে। ঘুম পেয়ে যাচ্ছে যে।

পরদিন সকালে উঠে দেখল কাল একটা ইঁদুর ধরা পড়েছে। সামুমামা বলল, "ওটাই তো ভূতু, ইঁদুর-রূপ ধারণ করেছে।"

"আর ভূতি তাহলে কোথায় ?"

"আছে এখানেই আনাচে-কানাচে। ওটাকে কাল ধরব।"

ছবি : অনূপ রায়

"মা বলতো আমি গালে
কি লাগিয়েছি ?"
"ঠিক বলেছ ! বোরোলীন ! তুমি বলো বোরোলীন লাগালে
গায়ের চামড়া ভালো থাকে। তাইতো আমি মুখে, হাতে,
পায়ে লাগিয়েছি। এবার আমাকে একটা হামু দাও।"
ছোটদের ত্বকের সুরক্ষার জন্য
সুরভিত অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম
বোরোলীন
সাধারণ কাটা-ছড়ার জন্য
একটি কার্যকরী অ্যান্টিসেপটিক
BOROLINE
জি ডি ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড আশা মহল কলকাতা ৭০০০৮৮
HTC-GDP-3760R

বিজ্ঞানবিচিত্রা

চঞ্চল পাল

চট করে ঠাণ্ডা

সব পদার্থের তাপ ছড়িয়ে ঠাণ্ডা হবার ক্ষমতা সমান নয়। তাই একই তাপমাত্রা থেকে ঠাণ্ডা হতে লোহার চেয়ে কাঠের সময় লাগে বেশি। কিন্তু উনুনের গনগনে আঁচ থেকে তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে যায় এমন পদার্থও আছে। তবে তা প্রাকৃতিক নয়, 'নাসার' অধীন জনসন্ স্পেস সেন্টারের তৈরি একটি সঙ্কর ধাতু—নাম দেওয়া হয়েছে 'হাই-টেম্পারেচার রি-ইউসেবল সারফেস ইনসুলেশন' বা সংক্ষেপে 'এইচ্-আর্-এস্-আই'। চুল্লির ১৩০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় অনেকক্ষণ ফেলে রাখলেও আগুন থেকে তুলে ফেলার মাত্র ১০ সেকেণ্ড পরেই এটাকে হাত দিয়ে ধরা যায়। এই পদার্থের কয়েক হাজার চৌকো টালি দিয়ে মহাকাশফেরির বাইরের আবরণ তৈরি করা হবে। এর ফলে একই মহাকাশফেরি বার বার যাতায়াত করলেও বায়ুর ঘর্ষণে ঝলসে যাবে না।

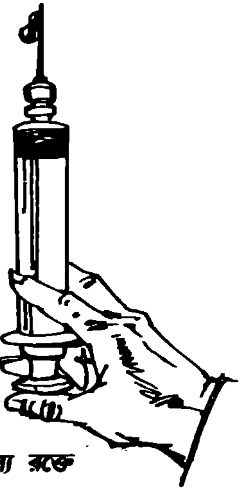

খিদের রহস্য রক্তে

একটা কুকুর যদি পুরো একদিন খেতে না পায় তাহলে খিদেয় ছটফট করবেই। কিন্তু সবে পেট ভরে খেয়েছে এমন কুকুরের রক্ত যদি উপোস-করে-থাকা কুকুরের রক্তে ইঞ্জেকশন করে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে ঐ ক্ষুধার্ত কুকুরের খিদে বেশ কিছুক্ষণের জন্য কমে গেছে। আবার, ক্ষুধার্ত কুকুরের রক্ত পেট-পুরে-খাওয়া কুকুরের রক্তে মিশিয়ে দিলে পেট-ভরা কুকুরের আবার খিদে পেয়ে যাবে। পরীক্ষাটি চালিয়েছিলেন চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এ জে কার্লসন এবং এ বি লাকহার্ড। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, পাকস্থলীতে কতটা খাবার আছে তার ওপর খিদে সব সময় নির্ভর করে না, বরং রক্তের রাসায়নিক পরিবর্তন তার জন্য অনেকাংশে দায়ী। যদিও রক্তের সেই বিশেষ উপাদানগুলি এখনও শনাক্ত করা যায়নি তবু দেখা গেছে যে, 'ডি-অ্যামফেটেমাইন' নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ যে-কোনও প্রাণীর রক্তে মিশিয়ে দিলে খিদে বেশ কমে যায়। কে জানে ভবিষ্যতে খাদ্য-সমস্যার সমাধানে এটা কাজে লাগবে কি না!

শুভ্রদীপের বুদ্ধি

রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়

রহস্য-রোমাঞ্চ লাইনে আসার অভিজ্ঞতার বয়েস হল বত্রিশ। এই বত্রিশ বছরে, বাংলায় যত বাঘা-বাঘা গোয়েন্দা আছে, সবারই ছাড়পত্র মিলেছে আমার হাতে। এই দুনিয়ায় যত রকমের কূট-বুদ্ধির মানুষ আছে, রহস্য উন্মোচনের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর প্রতিভা আছে, সবারই চেহারা আর চরিত্র আমার নখদর্পণে। আকাশে, মাটিতে ও পাতালে বিচিত্র সব ঘটনার সৃষ্টি করে বিচিত্রতর যে মানুষগুলো আজ পৃথিবীর বুকে দাপটে রাজত্ব করে চলেছে, তারা সকলেই আমার পরিচিত। কারণ, আমার কলমের ডগাতেই নির্ভর করে তাদের অস্তি এবং নাস্তি।

সেই আমি কি না একেবারে বোকা বনে গেলাম—যাকে বলে একেবারে থ ! তাও আবার একটা বাচ্চা ছেলের কাছে, যার বয়েস এখন মোটে তেরো !

আসছিলাম বহরমপুর থেকে কলকাতায়। উদ্দেশ্য আমার ছোট ছেলে শুভ্রদীপের 'আই, কিউ' টেস্ট করানো। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ যত বড় বড়ই দেওয়া হোক না কেন, শুভ্রদীপের কাছে তা জলবৎ তরলম্। সিঁড়ি-ভাঙা সরলও তার কাছে অতি-সরল। কিন্তু আশ্চর্য, বুদ্ধির অঙ্কের বেলায় সে একেবারে ঠিক উলটোটি। অর্থাৎ ভীষণ রকম ভোঁতা। ক্লাস টু-এর একটা ছেলেও যা ঝট করে বলে দিতে পারে, ক্লাস সেভেনে পড়েও শুভ্র তা ধরতেই পারে না। ফলে, প্রতি বছর প্রতি পরীক্ষাতেই বুদ্ধির অঙ্কগুলোর জন্যে সে দু-টাকা দামের রসগোল্লার চেয়েও বড় সাইজের গোল্লা পায় এবং মায়ের গোল-গোল চোখের সামনে থেকে সরে পড়ে। ওদের স্কুলের হেডমাস্টারমশাই একদিন আমাকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, আমি তাঁর দু-একটা কথার জবাব দিলাম এবং বেশির ভাগ সময়ই নিশ্চুপ থাকলাম। শুভ্রদীপের এ-হেন নির্বুদ্ধিতার আসল কারণটা কী, আমি নিজেই জানি না তো জবাব দেব কী ! উপস্থিত সেই হেডমাস্টারমশাইয়ের নির্দেশেই আমি চলেছি কলকাতায়, একজন সাইকিয়াট্রিস্ট দেখিয়ে ওর আই. কিউ টেস্ট করাবার জন্যে। পাশ করার মতো নম্বর নিচু ক্লাসে ও পেয়ে যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু এবার তো ক্রমেই উঁচুতে উঠছে, আর এড়িয়ে যাওয়া ঠিক হবে না ! বিশেষ করে অন্যান্য সাবজেক্টগুলোয় সে যখন রেকর্ড-মার্কস রাখে।

দুপুরের খাওয়া সেরে যথাসময়ে লালগোলা প্যাসেঞ্জার ধরলাম। গাড়িখানা নামে প্যাসেঞ্জার, কিন্তু ছোটে ভাল। সব স্টেশনে ধরে না, যেখানে ধরে, বেশি সময় নেয় না। মাঝামাঝি জায়গায় একটা ফাঁকা কম্পার্টমেন্ট দেখে আমরা উঠেছিলাম। কী একটা উপলক্ষে সেদিন ছুটি ছিল, নাকি আমাদের বরাতজোর জানি না, যাত্রীও ছিল তাই খুব কম। আমাদের তিনজনকে নিয়ে সর্বসাকুল্যে জনা কুড়ি-পঁচিশ। হাত-পা ছড়িয়ে দিব্যি গল্প করতে করতে চলেছি। কৃষ্ণনগর পার হল, রানাঘাট পার হল, নৈহাটিও পেরিয়ে গেল গাড়িখানা। ট্রেনের যাত্রী-সংখ্যা তখন আরো কমে এসেছে। বড়জোর জনা বারো-তেরো। বুড়ো-বুড়ি জনা-পাঁচেক, জনা-চারেক বছর কুড়ি-বাইশের ছোকরা, আর আমরা তিনজন।

হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। মোটামুটি রাইট টাইমেই রান করছে গাড়িখানা। কিন্তু হঠাৎ কাঁকিনাড়ার কাছাকাছি এসে

ট্রেনখানার গতি গেল কমে। জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। কিছুই দেখা যায় না, নীরন্ধ্র অন্ধকার চারদিকে। এদিকে ট্রেনের গতি তখন ক্রমেই কমতে শুরু করেছে। হয়তো থেমেও যেতে পারে এমন অবস্থা।

শুভ্রদীপের দু-চোখে তখন রাজ্যের ঘুম। গৃহিণীর মুখের দিকে তাকালাম। বলতে চলেছি, এই বোধ হয় লেট করা শুরু হল, শেয়ালদা পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে, কিন্তু বলা আর হল না। দেখি, গৃহিণীর মুখ-চোখের অবস্থা তখন কাহিল। একমাথা ঘোমটা টেনে শাড়ির প্রান্তটা তিনি তখন তাঁর গলায় চাপা দিচ্ছেন। অর্থাৎ গয়নাগুলো ঢাকা দিচ্ছেন। আজকাল এই লাইনে যে যখন-তখন ডাকাতি ছিনতাই হয়, সে-খবর তিনি রাখেন ঠিকই, কিন্তু ওই রাখা পর্যন্তই। কোথাও বেরোবার সময় সে-কথা আর মনে রাখেন না কিছুতেই। যতক্ষণ না শরীর ভারী-ভারী মনে হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি গয়না দিয়ে মুড়িয়ে নেন নিজেকে। এ নিয়ে অনেক বাক-বিতণ্ডা ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে, কিন্তু শেষে ওগুলো ডাকাতের ধন ওঁর কাছে গচ্ছিত রয়েছে মনে করে হাল ছেড়ে দিয়েছি। অলঙ্কার ওঁর কাছে একটা মস্ত বড় অহঙ্কার যেন।

কিন্তু এখন? এখন তবে সোনা-মুখ সিসে হয়ে গেল কেন বাপু! এ-কথা তো মুখে বলা যাবে না, তাই চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "কী হল, অমন করে তাকিয়ে আছ কেন?"

গৃহিণী কিছু বললেন না, মুখখানা ঘুরিয়ে নিলেন। নিলেও, বেশ বুঝতে পারলাম, সকরুণ দৃষ্টিটা ওঁর ওই ছোকরা চারজনের দিকেই। অর্থাৎ অকূল পাথারে আজ ওরাই ওঁর ভরসা। যদি কিছু বিপত্তি ঘটে, ওরাই সামলাতে পারে। হাজার হলেও জোয়ান ছেলে তো!

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেনখানা থামো-থামো হয়ে গেল এই সময়। সেই ঝাঁকুনিতে শুভ্রদীপের তন্দ্রাও গেল টুটে। হাত-ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে জানলার বাইরে মুখ বাড়ালাম আবার। কৃষ্ণপক্ষের শীতের রাত যেন থমথম করছে। লাইনের ধারে একটা সরু রাস্তা, রাস্তার ওপারে এক-আধটা দোকান, দু-চারজনের অস্পষ্ট গলার স্বর। ট্রেনটা বোধ হয় সিগন্যাল পায়নি, তাই স্টেশনের একটু আগেই থেমে পড়েছে। হঠাৎ—

চোখের পলকে কামরার সমস্ত দৃশ্যপটটাই যেন পালটে গেল। ছোকরা চারজনের দুজন দেখি দুধারে দুটো দরজা আগলে দাঁড়িয়ে পড়েছে, আর বাকি দুজনের একজন যেন ম্যাজিক-হাতে ঝপঝপ করে আমার গৃহিণীর হাত গলা থেকে গয়নাগুলো খুলে খুলে নিয়ে একটা রুমালে জড়ো করে রাখছে। বাকিরা দাঁড়িয়ে আছে সামনেই। হাতে একটা ছোরা জাতীয় কিছু, কামরার টিমটিমে আলোতেও যার ফলাটা বেশ চিকচিক করছে। আর, আমার গৃহিণী ভয়-ফ্যাকাসে মুখে একবার তাকাচ্ছেন আমার দিকে, আরেকবার ছোরাটার দিকে। কিন্তু আমি তখন করতেই বা পারি কী? করা মানেই তো মরা।

শুভ্রদীপ এতক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল ওদের দিকে। শেষ চুড়িগাছা খুলে নিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছে ছোকরা দুজন, হঠাৎ সে আমার দিকে ফিরে বলে উঠল, "ওরা কী বোকা দেখ বাবা, গিল্টি আর সোনাও চেনে না! ওগুলোর নতুন দামই তো তিরিশ-পঁয়ত্রিশ টাকার বেশি নয়। তার চেয়ে—"

শুভ্রদীপ থেমে গেল। হঠাৎ দেখি ছোকরা দুজন এক মুহূর্তের জন্যে কেমন থমকে গেল। কী যেন ভাবল, তারপর পেছনের ছোকরাটি, যার হাতে ছোরা, এগিয়ে এল আমার কাছে। এসেই টপ করে আমার বাঁ-হাত থেকে ঘড়িটা নিল ছিনিয়ে। তারপর আমার বাঁ-গালে প্রচণ্ড একটা চড়

কষিয়েই দে ছুট !

চোখের সামনে আমি তখন সর্ষেফুল দেখছি। বেশ কিছুক্ষণের জন্যে আমি বোধহয় আর আমার মধ্যে ছিলাম না। দরজার ওপারের অন্ধকারে নিঃশব্দে ওদের লাফিয়ে পড়া, আমার গৃহিণীকে লক্ষ করে একটা কিছু ছুঁড়ে মারা, "ঘড়িটা তো আর ছেলে-ভুলোনো নয়" কথা কটা কানে আসা ছাড়া বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুই আমার কাছে তখন ঝাপসা।

যখন সম্বিত ফিরে পেলাম, ট্রেন তখন ধীরের গতিতে শেয়ালদার রেলওয়ে ইয়ার্ডের মধ্যে ঢুকছে। নিজের কোলের ওপর বাঁ-হাতটা চেপে ধরে ডান হাতটা আমার গালে বুলোতে বুলোতে গৃহিণী বললেন, "চড়টা খুব জোরেই মেরেছে মুখপোড়াটা, পাঁচ আঙুলের দাগ বসে গেছে গা একেবারে !"

সঙ্গে সঙ্গে আমার লুপ্ত পৌরুষ যেন ফিরে এল। একরকম দাঁত খিঁচিয়েই বলে উঠলাম, "হল তো, গয়না পরার শখ মিটেছে ? মাঝ থেকে তোমার গয়নার সঙ্গে আমার ঘড়িটা পর্যন্ত—"

শাড়ির আড়াল থেকে রুমালে-জড়ানো একটা পুঁটলি দেখিয়ে একমুখ হেসে গৃহিণী একটু চাপা গলায় বললেন, "কিচ্ছু খোয়া যায়নি গো, কিছু খোয়া যায়নি। তোমার ছেলের জন্যে সব কিছু ফিরে পেয়েছি। শুধু তোমার ঘড়িটা—"

অবাক বিস্ময়ের একটা অস্ফুট শব্দই শুধু আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, "তার মানে ?"

মুখ-ঝামটা দিয়ে গৃহিণী বলে উঠলেন, "তার মানে কলকাতায় গিয়ে ছেলের বদলে তোমার নিজের বুদ্ধিটাই একবার মেপে নেবে চলো ! বৃথাই এতদিন রহস্য-কাহিনী নিয়ে মাথা ঘামালে—ঘটে যদি উপস্থিত বুদ্ধি বলতে কিছু থেকে থাকে ! তোমার একফোঁটা ছেলেটার যা আছে—"

হাতে আয়না থাকলে বলতে পারতাম, সেই সময় আমার চোখজোড়া ঠিক রসগোল্লার মতো গোল-গোল হয়ে উঠেছিল কি না !

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮-ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইল।

১। **প্রকাশস্থান** ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০০১

২। **প্রকাশকাল** পাক্ষিক

৩। **প্রকাশক ও মুদ্রাকর** বাপ্পাদিত্য রায়, ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০০১

৪। **সম্পাদক** নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ভারতীয় নাগরিক, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০০১

৫। **যে-সকল ব্যক্তি এই সংবাদপত্রের মালিক এবং যাঁহারা মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক অংশীদার বা শেয়ার-গ্রহীতা, তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা :**

(ক) **মালিক** আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০০১

(খ) **মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক শেয়ারগ্রহীতা** অশোককুমার সরকার, অলকা সরকার, অভীককুমার সরকার, অরূপকুমার সরকার, অধীপকুমার সরকার, অশনিকুমার সরকার, নাবালক পুত্র অরিত্রকুমার সরকারের পক্ষে অরূপকুমার সরকার। ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০০১

আমি বাপ্পাদিত্য রায় এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস-মতে সত্য।

১ মারচ, ১৯৮৩ বাপ্পাদিত্য রায়

প্রকাশক

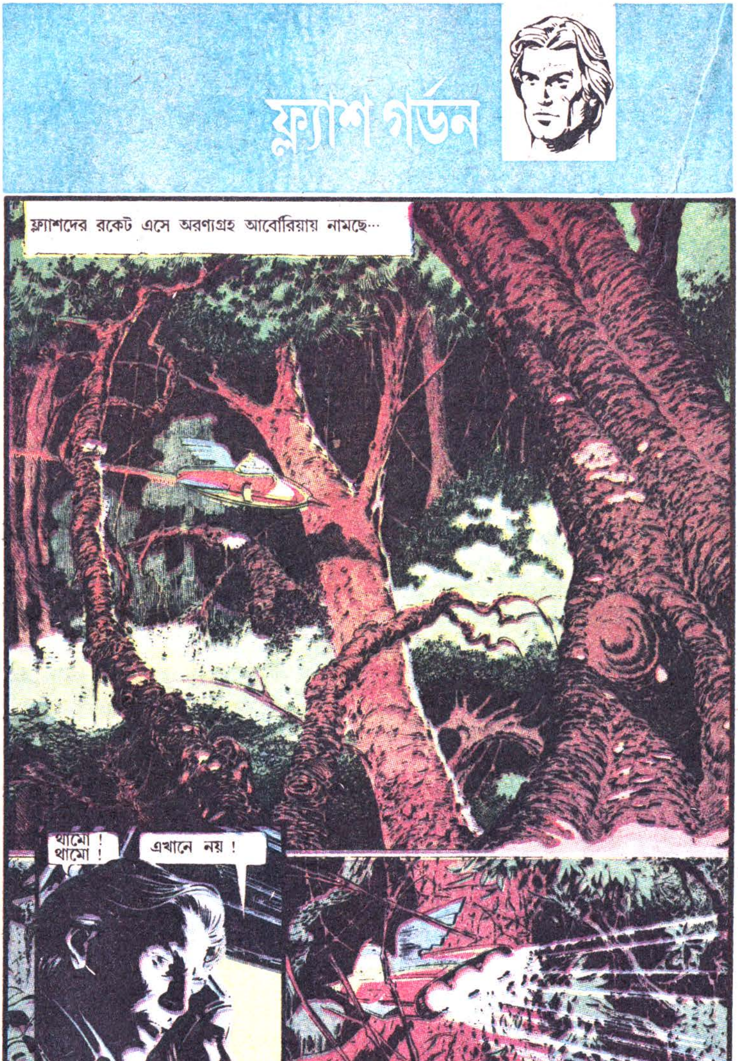
ফ্ল্যাশ গর্ডন
ফ্ল্যাশদের রকেট এসে অরণ্যগ্রহ আবোরিয়ায় নামছে…
থামো ! থামো !
এখানে নয় !
এর পরে আগামী সংখ্যায়

জঙ্গলগড়ের চাবি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : সকালবেলা পার্কে কারা যেন কাকাবাবুকে গুলি করে পালিয়ে যায়। কাকাবাবু প্রাণে বেঁচে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর শরীরে পক্ষাঘাতের মতন হয়ে গেল। স্বাস্থ্য ফেরাবার জন্য তাঁকে নিয়ে আসা হল ত্রিপুরায়। সেখানে নানারকম উপদ্রব হতে লাগল। তারপর এক রাতে একদল মুখোশধারী এসে সন্তু আর কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে গেল জোর করে। একটা নির্জন বাড়িতে ওদের বন্দী করে রাজকুমার নামে একজন লোক কাকাবাবুর ওপর নানারকম অত্যাচার করতে লাগল, তাঁর কাছ থেকে জঙ্গলগড়ের খবর জানবার জন্য। এমন সময় কাকাবাবুর বন্ধু নরেন্দ্র ভার্মা পুলিশ নিয়ে এসে পড়ায় পালিয়ে গেল ওরা। সঙ্গে নিয়ে গেল সন্তুকে। এবারে টিলার ওপর একটা পাথরের বাড়িতে আটকে রাখল সন্তুকে। রাজকুমার সন্তুকে দিয়ে জোর করে একটা চিঠি লেখাল কাকাবাবুর কাছে। কাকাবাবু যখন সেই চিঠি পেলেন, তার আগেই সন্তু পালিয়েছে। তারপর···

॥ ২৪ ॥

ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ শুনেই সন্তু তরতর করে সেই ঝাঁকড়া গাছটায় চড়তে শুরু করে দিল। বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে লুকিয়ে রইল পাতার আড়ালে। তার শরীরের সমস্ত শিরা যেন টানটান হয়ে গেছে। সে আবার ধরা পড়তে চায় না কিছুতেই।

প্রথমে মনে হয়েছিল অনেকগুলো ঘোড়া আসছে। তারপর বোঝা গেল একটাই ঘোড়ার পায়ের শব্দ। ঘোড়াটা ঠিক এই দিকেই আসছে। সন্তু যে-ঘোড়াটার পিঠে এসেছিল, সেটা শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে আছে।

একটু বাদেই দেখা গেল একটা ঘোড়া এসে দাঁড়াল সন্তুর ঘোড়াটার পাশে। তার পিঠে যে বসে একটা আছে, তাকে চিনতে সন্তুর প্রথমে একটু অসুবিধে হয়েছিল। খাকি প্যান্ট আর একটা ছাই-রঙের হাফশার্ট পরা গাঁট্টাগোঁট্টা লোক। ঘোড়া থেকে নেমে লোকটি এই গাছের দিকে মুখ ফেরাতেই তার সিন্ধুঘোটকের মতন ঝোলা গোঁফ দেখেই সন্তু চিনতে পারল এ তো সেই 'মেজর'।

একটু দূরে জেলে দু'জনের কথাবার্তা তখনও শোনা যাচ্ছে। 'মেজর' নদীর ধারে এসে উঁকি দিয়ে দেখল একবার। তারপর মুখ উঁচু করে বলল, "কই হে সন্তুবাবু, কোথায় লুকোলে ? চলে এসো, ভয় নেই !"

সন্তু একেবারে নিশ্বাস বন্ধ করে রইল, যাতে কোনো শব্দ না হয়। কিন্তু পাতার আড়ালে তার সম্পূর্ণ শরীরটা আড়াল পড়েনি। এখানে বেশিক্ষণ আত্মগোপন করে থাকা যাবে না।

মেজর আবার বলল, "কোন্ গাছে উঠে বসে আছ ? ও সন্তুবাবু, শিগগির নেমে এসো ! সময় নষ্ট করে লাভ নেই !"

সন্তু বুঝতে পারল, সত্যিই সময় নষ্ট হচ্ছে। 'মেজর' সবকটা গাছ ভাল করে দেখতে শুরু করলেই সে ধরা পড়ে যাবে। তাছাড়া তাড়াহুড়ো করে ওঠার সময় তার একপাটি চটি পড়ে আছে গাছের নীচে।

সন্তু ডালপালা সরিয়ে বলল, "আসছি !"

তারপর সরসরিয়ে নেমে পড়ল। মেজর তার সামনে এসে দাঁড়াতেই সন্তু একটুও

অবাক হবার কিংবা ভয় পাবার ভাব না দেখিয়ে খুব সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করল, "আপনি আমায় কী করে খুঁজে পেলেন ?"

মেজর সারা মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "এ তো খুব সহজ ! তুমি আমাদের এই সব ঘোড়া চালাতে পারবে না তা জানি ! ঘোড়া তোমাকে যেখানে নিয়ে যাবে, সেইখানেই তোমায় যেতে হবে ! এই ঘোড়াগুলো নদীর ওপারের একটা গ্রামে থাকে। সেইজন্য ছাড়া পেলে ওরা সেইদিকেই যায় !"

সন্তু বলল, "বিচ্ছিরি ঘোড়া ! আমি নেপালে এর চেয়ে অনেক ভাল ঘোড়ায় চেপেছি !"

মেজর বলল, "সে যাই হোক ! শেষ পর্যন্ত সেই পালালে তা হলে ? এখন কী হবে ? তুমি আমায় ফাঁসাবার ব্যবস্থা করে এসেছ ! রাজকুমার ঘুম থেকে উঠে যদি দেখে যে, তুমি নেই, অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমার পেটে একটা গুলি চালাবে না ? এখন তোমায় যদি আমি আবার ধরে নিয়ে যাই, তাহলে আমি হয়তো বখশিস পাব, কিন্তু তোমার কী অবস্থা করে ছাড়বে বলো তো ?"

সন্তু বলল, "দোষ তো আপনারই।

আপনি ভাল করে পাহারা দেননি কেন ? দরজা সব সময় খোলা। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়লুম, কেউ আমায় দেখতেই পেল না!"

'মেজর' মুচকি হেসে বলল, "আমি কিন্তু দেখেছি! রান্নাঘরের জানলা দিয়ে সব লক্ষ করছিলুম!"

সন্তু এবার লোকটির দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল। কাল রাত্তির থেকেই এ লোকটির ব্যবহার সে ঠিক বুঝতে পারছে না। লোকটা কি ভালমানুষ, না মিচকে শয়তান ?

লোকটি বলল, "শোনো, সন্তুবাবু, তোমায় সব কথা খুলে বলি। আমার নাম নরহরি কর্মকার। একটা গভর্নমেণ্ট অফিসে সিকিউরিটির ডিউটি করতুম। একবার লোভের বশে হিরে চুরি করেছি। সেজন্য আজ আমার বড় লজ্জা। কিন্তু নিজের দোষে তারপর আমি ক্রমশই চোর-ডাকাতের দলে জড়িয়ে পড়ছি। এ আমি চাই না। শেষে দাগি আসামি হয়ে সারা জীবন কাটাতে হবে ? তাই আমি ইচ্ছে করে তোমার পালাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। এসো, তোমাতে আমাতে দু'জনেই এখন পালাই। তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে অনেক বড় বড় লোকের চেনা আছে। তাঁকে বলে আমার একটু ব্যবস্থা করে দিও। আমি দু'এক বছর জেল খাটতে রাজি আছি, তার বেশি শাস্তি যেন না হয়!"

সন্তু কথাগুলো শুনে গেল, কিন্তু বিশ্বাস করবে কি করবে না, তা এখনো ঠিক করতে পারল না।

নরহরি কর্মকার বলল, "এখানে আর থাকা ঠিক নয়। ওরা খুঁজতে শুরু করলে প্রথমে এখানেই আসবে! চলো, এক্ষুনি আগরতলা যাই! তুমি আমার সঙ্গে এক-ঘোড়ায় চেপে যেতে পারবে ?"

সন্তু বলল, "আমি এখন আগরতলায় যাব না!"

নরহরি কর্মকার চোখ প্রায় কপালে তুলে বলল, "আগরতলায় যাবে না ? তোমার কাকাবাবু তো সেখানেই আছেন!"

সন্তু বলল, "তা হোক। এখানে কাছেই জঙ্গলগড়। আমি সেখানে যেতে চাই!"

নরহরি বলল, "এখানে জঙ্গলগড় ? কে বলল তোমাকে ?"

সন্তু দূরের জেলে দু'জনের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, "ঐ ওরা জানে। ওরা বলাবলি করছিল!"

নরহরি অবজ্ঞার হাসি দিয়ে বলল, "দূর! ওসব বাজে কথা! ওরকম কত জঙ্গলগড় আছে! কোথাও জঙ্গলের মধ্যে দু'একটা ভাঙা বাড়ি-টাড়ি থাকলেই লোকে তার নাম দেয় জঙ্গলগড়! সেরকম জায়গার তো অভাব নেই এ দেশে!"

সন্তু বলল, "তবু আমি এই জঙ্গলগড়ে একবার যেতে চাই।"

নরহরি বলল, "কী ছেলেমানুষি করছ! আসল জঙ্গলগড়ের খবর তোমার কাকাবাবু ছাড়া আর কেউ জানে না। এই রাজকুমার আর অন্যরা কি কম খোঁজাখুঁজি করেছে!"

সন্তু বলল, "ওরা যে জগলগড়ের কথা বলছে, সেখানে একটা সোনার মুদ্রা পাওয়া গেছে!"

নরহরি চমকে উঠে বলল, "মুদ্রা, মানে টাকা ? সোনার টাকা ? চলো তো!"

দু'পা গিয়েই নরহরি আবার থেমে গেল। মুখে ফুটে উঠল একটা অসহায় ভাব। ডান হাত দিয়ে গোঁফ চুলকোতে চুলকোতে বলল, "না, না, সন্তুবাবু, আমায় আর লোভ দেখিও না। সোনার টাকা শুনেই আমার মনটা চমকে উঠেছিল! একবার হিরে চুরি করে আমি হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি যে আমাদের মতন লোকদের হিরে মুক্তো সোনাদানা সহ্য হয় না! ওসবে একবার হাত দিলেই বিপদ! জঙ্গলগড়ের

সোনায় যদি আমি হাত দিই, তা হলে রাজকুমারের দলবল আমায় একেবারে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে !"

সন্তু আর কোনো কথা না বলে এগিয়ে গেল জেলে দু'জনের দিকে। নরহরি তার পেছন পেছন এসে কাতরভাবে বলল, "কোথায় যাচ্ছ, সন্তুবাবু ! আমি ভাল কথা বলছি, আগরতলায় চলো !"

সন্তু সে কথায় কর্ণপাত করল না।

জেলে দু'জন এখন কথা থামিয়ে মন দিয়ে মাছ ধরছে। একটা জাল ফেলে সেটা টেনে তুলছে খুব আস্তে আস্তে। জাল টেনে তোলার সময় তারা একেবারে চুপ করে থাকে।

সন্তু আর নরহরি ওদের কাছে যখন পৌঁছল, তখনও জালটা পুরো টেনে তোলা হয়নি। বড় জেলেটি ওদের দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল শুধু, কোনো কথা বলল না।

জালটা তোলার পর দেখা গেল তার গায়ে কয়েকটা ছোট ছোট মাছ লেগে আছে। চকচকে রুপোলি রঙের।

ছোট জেলেটি জাল থেকে মাছ ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খালুইতে রাখতে লাগল। বড় জেলেটি গম্ভীরভাবে বলল, "এ মাছ বিক্কিরি নেই, মহাজনকে দিতে হবে !"

নরহরি লোকটার ঘাড় চেপে ধরে হুংকার দিয়ে বলল, "তোর মাছ কে চাইছে ? জঙ্গলগড়ের সোনার টাকা কে নিয়েছে, আগে বল্ !"

লোকটি ভয় পেয়ে গিয়ে বলল, "সোনার টাকা ! আমি তো সোনার টাকা নিইনি ! মা কালীর দিব্যি বলছি !"

"তবে কে নিয়েছে ?"

"সে তো সুবল !"

"কোথায় সেই সুবল ? এক্ষুনি আমাদের নিয়ে চল তার কাছে ?"

ছোট জেলেটি এবারে বলল, "সুবলকাকা তো মরে গেছে ! তাকে সাপে কামড়েছে !"

নরহরি প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলল, "মরে গেছে ? মিথ্যে কথা বলছিস আমার কাছে ? এক্ষুনি থানায় নিয়ে যাব !"

সন্তু বলল, "ওরা আগেই বলছিল সুবলকে সাপে কামড়েছে। ঠিক আছে, সেই জঙ্গলগড় জায়গাটা কোথায়, আমাদের একটু দেখিয়ে দেবে চলো তো !"

নরহরি বলল, "যেখানে সোনার টাকা পাওয়া গেছে, সেই জায়গাটা আর কে দেখেছে ? তুই দেখেছিস ?"

বড় জেলেটি বলল, "বাবু, সেখানে যেও না। সেখানে খুব সাপখোপের উপদ্রব। জায়গাটা ভাল না !"

নরহরি বলল, "সাপ থাক আর যাই থাক, সে আমরা বুঝব। শিগগির সেখানে আমাদের নিয়ে চল্ !"

বড় জেলেটি কাঁদো-কাঁদো ভাবে বলল, "সে যে অনেক দূরের পথ। সেখানে তোমাদের নিয়ে গেলে আমার যে আজকের দিনটার রোজগার নষ্ট হয়ে যাবে !"

নরহরি বলল, "মনে কর তোর জ্বর হয়েছে। তা হলেও কি মাছ ধরে রোজগার করতে পারতি ?"

জেলেটি বলল, "আমার জ্বর হয়নি, তবু শুধু শুধু মনে করতে যাব কেন ? মনে করো, তুমি রাজা, তা হলেই কি তুমি রাজা হয়ে যাবে ?"

সন্তু বলল, "ঠিক আছে, সবটা পথ তোমায় যেতে হবে না। খানিকটা দূর এগিয়ে দিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দাও ঠিক কোন্‌দিকে যেতে হবে !"

ছোট জেলেটিকে সেখানেই বসিয়ে রেখে ওরা তিনজন চলল, নদীর ধার ঘেঁষে ঘেঁষে। তার আগে নরহরি ঘোড়া দুটোকে ঠেলে ঠেলে নদীতে নামিয়ে দিয়ে এল। ঘোড়া দুটো সাঁতরাতে সাঁতরাতে চলে গেল নদীর ওপারে।

খানিকটা দূরে গিয়েও নরহরি থেমে গিয়ে ফিসফিসিয়ে সন্তুকে বলল, "উঁহুঃ, ঐ ছোঁড়াটাকে ওখানে বসিয়ে রেখে আসা ঠিক হল না। কেউ আমাদের খুঁজতে এলে ওর কাছ থেকে সব কথা জেনে যাবে।"

সে বড় জেলেটিকে বলল, "এর পর সারাদিন মাছ ধরলে তোর আর কত রোজগার হত ?"

জেলেটি বলল, "মাছ ধরতে পারি না পারি, রোজ মহাজনকে দশ টাকা শোধ দিতে হয়। এখন তো মাছ ওঠেই না।"

নরহরি তার পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে দিয়ে বলল, "এই নে। এখন ঐ ছেলেটাকেও ডাক। ছেলেটাও আমাদের সঙ্গে চলুক। আমাদের জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে তোরা আজ গাঁয়ে ফিরে যাবি। খবরদার, কারুকে কিচ্ছু বলবি না! এসব পুলিশের কাজ, খুব গোপন রাখতে হয়!"

প্রায় এক ঘণ্টা চলার পর ওরা নদীর ওপর একটা সাঁকো দেখতে পেল। খুব নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো। সেটার ওপর দিয়ে খুব সাবধানে ওরা এক এক করে চলে এল অন্য ধারে।

আবার নদীর ধার দিয়েই হাঁটতে হল প্রায় দেড় ঘণ্টা। এদিকটায় বেশ ঘন জঙ্গল। অনেক গাছের ডালপালা ঝুঁকে পড়েছে নদীর জলে।

আসবার পথে গোটা দুয়েক গ্রাম চোখে পড়েছে, কিন্তু এই জায়গাটা একেবারে জনমানবশূন্য। কয়েকটা পাখির তীক্ষ্ণ ডাক শোনা যাচ্ছে। নদীটাও ক্রমশ সরু হয়ে আসছে। সামনেই পাহাড় আছে মনে হয়।

এক জায়গায় বড় জেলেটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "এবারে আপনারা যান, আমরা আর যাব না!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "জঙ্গলগড় আর কতদূর ?"

"সামনে আর একটুখানি গেলেই দেখতে পাবেন। একেবারে নদীর ধারেই।"

নরহরি জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের গাঁ ছেড়ে এত দূরের জঙ্গলে এসেছিলে কেন শুনি ? তোমাদের নিশ্চয়ই কোনো মতলব ছিল!"

বড় জেলেটি বলল, "নিয়তি, বাবু, নিয়তি! এইদিকে এক গাঁয়ে সুবলের শ্বশুরবাড়ি। একটু আগের ফাঁকা মাঠ দিয়েও যাওয়া যায়, আর এই জঙ্গলের মধ্য দিয়েও যাওয়া যায়। তা সুবলের কী দুর্বুদ্ধি হল। বলল, এই জঙ্গলের মধ্য দিয়েই যাই, যদি দু'একটা খরগোশ মারতে পারি। সেই লোভেই তার কাল হল।"

নরহরি বলল, "ঠিক আছে, তোমরা এবারে ফিরে যেতে পারো!"

বড় জেলেটি বলল, "অনেক বেলা হয়ে গেল, আপনারা এখন জঙ্গলে যাবেন, তারপর ফিরবেন কখন ? জায়গাটা ভাল না। তাছাড়া দুপুরে খাওয়া-দাওয়াই বা করবেন কোথায় ?"

নরহরি বলল, "সে আমরা বুঝব। তোমরা এখন যাও তো!"

ওরা চলে যাবার পর সন্তু আর নরহরি খুব সাবধানে এগোতে লাগল। একটু বাদেই তাদের চোখে পড়ল, মাটিতে নানারকম গর্ত, আর এখন সেখানে পাথর আর কাঠের টুকরো ছড়িয়ে আছে।

তারপর দেখা গেল একটা লম্বা পাথরের দেওয়াল। তার মধ্যে কয়েকখানা পাথরের ঘর, কিন্তু কোনোটারই ছাদ নেই। একটা কারুকার্য করা কাঠের দরজাও পড়ে আছে মাটিতে।

পাথরের দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে সন্তু ভাবল, এই কি তবে সেই জঙ্গলগড় ?

(ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

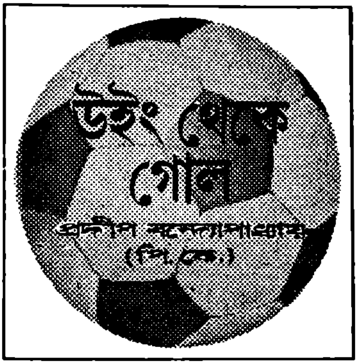

॥ ৫৮ ॥

উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে একটি ভাল বিদেশী ফুটবল দল ভারতে এল। সুলেভান ব্রাতিস্লাভা ছিল চেকোস্লোভাকিয়ার চ্যাম্পিয়ন টিম। উনিশশো বাষট্টির বিশ্বকাপ ফাইনালে ব্রাজিলের কাছে চেক দল হেরেছিল, এক গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর। সেই দলের চার-পাঁচজন ফুটবলার ব্রাতিস্লাভা টিমে ছিলেন। মিডফিল্ডার জোসেফ ম্যাসাপোস্ট, স্টপার পপলাহার এবং গোলকিপার সসকিকের তখন খুব নামডাক।

প্রথম খেলায় ব্রাতিস্লাভা ৫-০ গোলে মোহনবাগানকে হারাল। পরের ম্যাচে আমরা, মানে আই এফ এ টিম, হেরে গেলাম ১-৫ গোলে। বিশ্ববিশ্রুত স্টপার পপলাহার অনায়াসে বিপক্ষ দলের ফরোয়ার্ডদের ডজ করতেন। আমার মনে হয়েছিল, স্টপার বা সুইপারের এত ড্রিবল করা ভাল না, কিন্তু পপলাহারের আত্মবিশ্বাস এবং দক্ষতা এত বেশি ছিল যে, কখনও বিপদে পড়তেন না। লক্ষ করেছিলাম, তিনি একটি বিশেষ ধরনের ড্রিবল করেন। যেন ডান দিক দিয়ে বল নিয়ে যাবেন এই রকম ভান করে বাঁ পা টানেন, কিন্তু সেই পা বলের ওপর দিয়ে চলে যায় এবং ডান পায়ের টোকায় বল বাঁ পায়ের তলা দিয়ে নিয়ে ছিটকে বেরিয়ে যান। এইভাবে দুবার আমাকেও বোকা বনতে হল। তারপর, সেই স্মরণীয় মুহূর্তটি এল। আমি জানতাম, তিনি কী করবেন। তাই ডান দিক দেখিয়ে তাঁর বাঁ দিকে চলে গেলাম। ডান পায়ের টোকায় তাঁর বাঁ দিকে বলটি আসতেই, ছিটকে বেরোলাম আমি। গোলের সামনে পৌঁছে দেখি তিন-চারজন ডিফেণ্ডার আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। ফাঁকায় দাঁড়ানো আপ্পালারাজুকে বল দিতেই আমরা এক গোলে এগিয়ে গেলাম। সত্যিই সেদিন আমরা দারুণ খেলেছিলাম। কিন্তু ওরা আরও অনেক ভাল খেলে পাঁচ গোল করল।

একবার গোল করার জন্য হেড দিতে উঠে দারুণ অভিজ্ঞতা হল। পপলাহার আমার মাথার উপর থেকে ফ্লাইং ভলি করে বল বার করে দিলেন। একজন ফুটবলার যে অত উপরে ভলি করতে পারেন, নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

এর পর আন্তঃ রেল ফুটবলে আমরা তেমন সুবিধা করতে পারলাম না। সন্তোষ ট্রফিতেও সার্ভিসেসের কাছে বিশ্রীভাবে হেরে গেলাম। অথচ আমাদের রেলদল তখন যথেষ্ট ভাল, গোলে এসে গেছেন পিটার থঙ্গরাজ।

তখনও পর্যন্ত আমার একটা দুঃখ ছিল, একবারও ভেটারেন্স ক্লাবের বিচারে সেরা ফুটবলারের পুরস্কার পাইনি। ছাপ্পান্ন সাল থেকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। দু-তিনবার পেতে পেতেও সম্মান হাতছাড়া হয়ে গেছে। আমার জেদ ছিল, প্রবীণ ফুটবলারদের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেতেই হবে। পঁয়ষট্টিতে ভেটারেন্স ক্লাবের বিচারে আমি বছরের সেরা ফুটবলার হিসাবে ঘোষিত হলাম।

ঐ বছরেই আমার জীবনে আর-একটি আনন্দদায়ক ঘটনা ঘটল। আমার প্রথম কন্যা পলার জন্ম হল ইস্টার্ন রেলের সঙ্গে স্পোর্টিং ইউনিয়নের লিগ ম্যাচের দিন। আমরা, খেলোয়াড়রা জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় মাঠেই রেখে আসি। ব্যক্তিগত জীবনের অনেক সুখ-আনন্দই বিসর্জন দিতে হয়। তবু, তারই মধ্যে জীবন এগিয়ে চলে। মাঠে যতই ঘাম-রক্ত ঝরাক, ফুটবলারও জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনার স্পর্শ এড়িয়ে চলতে পারে না।

উনিশশো ছেষট্টিতেও ইস্টার্ন রেল দলে কিছু নতুন মুখ এসে গেলেন। প্রবীর মজুমদার, শম্ভু মৈত্র, বিশ্বনাথ পাল, তরুণ সিনহার মতো উদীয়মান ফুটবলাররা ভালই খেলছিলেন। লিগে আমাদের টিম ভালই খেলছিল। আমাদের ততদিনে অনেক চোট পেতে হয়েছে। সেই যে ছাপান্নর মেলবোর্ন অলিম্পিকে যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে খেলার সময় গোলকিপারের ঘুষি মাথায় লেগেছিল, তারপর থেকে অনেকবারই চোট পেয়েছি। আঘাতের পর আঘাত। খেলার আগ্রহটা কমে আসছিল।

ঐ বছরই পদ্মশ্রীতে ভূষিত 'চাইনিজ ওয়াল' গোষ্ঠ পালকে নিয়ে কিছু বলার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ। আমি চাইছিলাম, গোষ্ঠ পাল সম্পর্কে কিছু গল্প শ্রোতাদের শোনাতে। তাই একদিন সেই কিংবদন্তীর নায়কের বাড়িতে গেলাম। আমার কথা শুনে গোষ্ঠদা হাসতে হাসতে বললেন, "আমার কোনো গল্প-টল্প মনে নাই!"

বাধ্য হয়ে গেলাম গোষ্ঠদার সমসাময়িক নামী ফুটবলার সূর্য চক্রবর্তীর কাছে। তিনি একটা দারুণ গল্প শোনালেন। উনিশশো আঠাশ সালের কথা। কলকাতার বাইরে একটা টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে মোহনবাগান ডারহামের বিরুদ্ধে এক গোলে

গোষ্ঠ পাল (চাইনিজ ওয়াল)

হেরে গেল, খুব ভাল খেলেও। খেলা দেখতে এসেছিলেন স্বয়ং ভাইসরয় সাহেব। খেলা শেষ হওয়ার পর তিনি গোষ্ঠ পালকে ডেকে বললেন, "পল, খুব ভাল খেলেছ। এইমাত্র শুনলাম, ডারহাম অন্য টিমের একজন ফুটবলারকে খেলিয়েছে। তোমরা প্রোটেস্ট করলে ওদের টিম বাতিল হয়ে যাবে, ফাইনাল তোমরাই খেলবে।"

গোষ্ঠ পাল বললেন, "ধন্যবাদ স্যার, আপনার মহানুভবতার তুলনা নেই। তবে, আমি ক্যাপ্টেন হলেও এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারব না। আজ আমি ট্রাঙ্ককলে কলকাতায় কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলব, আমার মতামতও জানাব। ওঁদের সিদ্ধান্ত কাল সকালে আপনাকে জানিয়ে যাব।"

টেলিফোনে গোষ্ঠদা জানালেন, ভাইসয়র তাঁকে কী বলেছেন। তারপর বললেন, "ক্যাপ্টেন হিসেবে আমি মনে করি, প্রোটেস্ট করা উচিত নয়। কারণ আমরা এগারোজন হেরেছি এগারোজনের একটা দলের কাছেই। যাই হোক, আপনাদের

ছড়ার প্রাণী

সন্তোষ চক্রবর্তী

এক বনে এক বাঘ ছিল,
তাহার ভীষণ রাগ ছিল,
লম্বা ডোরাকাটার মধ্যে
মাথায় ঘায়ের দাগ ছিল।

এক গাছে এক কাক ছিল,
মধুর তাহার ডাক ছিল,
সারাটা গা কালোয় কালো,
লেজের দিকটা পাকছিল।

এক বিলে এক মাছ ছিল,
সাঁতারে তার নাচ ছিল,
আষাঢ় মাসে দিনদুপুরে
সর্দি লেগে হাঁচছিল।

সবাই শেষে বদ্যি ডাকে,
কাকের লেজে মাছের নাকে,
বাঘের মাথায় ওষুধ পড়ে।
ছড়ার প্রাণী বৃক্ষে চড়ে।

সিদ্ধান্ত তাড়াতাড়ি জানান, কাল সকালেই ভাইসয়র সাহেবের কাছে যেতে হবে।"

মোহনবাগানের কর্মকর্তারা সভায় বসে সিদ্ধান্ত নিলেন, গোষ্ঠ পালের কথাই ঠিক। মোহনবাগান প্রতিবাদ করল না। পরদিন সকালে সব কথা শুনে ভাইসরয় সাহেব গোষ্ঠ পালের পিঠে হাত রেখে বললেন, "পল, আজ আমি জানলাম কাকে বলে খাঁটি স্পোর্টসম্যান। তোমার এবং তোমার ক্লাব মোহনবাগান সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেল।"

উনিশশো ছেষট্টিতে আবার এশিয়ান গেমস, ব্যাঙ্ককে। ততদিনে চুনী গোস্বামী আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছেন। বলরাম চলে গেছেন। নতুন যাঁরা এলেন, বলছি না তাঁরা খারাপ খেলোয়াড়। কিন্তু আগে আমাদের মধ্যে যে বোঝাপড়া ছিল, ভারতীয় দলে তেমনটা আর দেখা গেল না। চুনী, বলরাম, আমি—আমরা না তাকিয়েও বুঝতে পারতাম, কে কখন কাকে কোথায় বল বাড়াবে। কার কোন্ পায়ে বল পেলে সুবিধা, তা-ও সবার জানা ছিল। চুনী-বলরাম চলে যাওয়ায়, ভারতীয় দলে যেন ছন্দপতন ঘটে গেল।

জার্নেল সিং তখনও আছেন, কিন্তু তখন আর তিনি দক্ষতার শীর্ষে নেই। বলা বাহুল্য আমারও দিন শেষ হয়ে এসেছে।

এশিয়ান গেমসের আগে ভারত মারডেকা টুর্নামেন্টে খেলতে গেল। অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমি যেতে পারলাম না। মোটামুটি ভাল ফর্মেই ছিলাম। দল নির্বাচনের ঠিক আগের দিন লিগে বি এন আর-এর বিরুদ্ধে দুটো গোলও করলাম। তখন বি এন আর টিমের দুই নির্ভরযোগ্য ডিফেণ্ডার অভিজ্ঞ অরুণ ঘোষ এবং উঠতি চন্দ্রেশ্বর প্রসাদ। বুঝতেই পারছ, গোল করাটা খুব সহজ কাজ ছিল না। (ক্রমশ)

বিচিত্র চোর

তুলসী সেনগুপ্ত

বার্ষিক পরীক্ষার ফল বেরুলে অঙ্কের স্যার সুধাংশুবাবু হেসে বুকুন আর পিকলুকে বললেন, "মানিকজোড় এবারও ব্রাকেটে থার্ড হলে।" উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে সুধাংশুবাবু চলে গেলেন।

বুকুন হেসে পিকলুকে বলল, "মা শুনলে গম্ভীর হবেন, আর বাবা হাসবেন।"

পিকলু জানাল, "আমার বাবা এসব নিয়ে মাথা ঘামান না। বাবা এখন যোগব্যায়াম নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। মাকেও ট্রেনিং দেবেন বলেছেন। যা মজার দৃশ্য হবে না," —বলেই ও খুব হাসতে থাকল।

বুকুন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "সেবারের মতো এবারও আমার সঙ্গে চল না দেউলগাঁয়ে। কালই দাদুর চিঠি পেয়েছি. আমাকে বিশেষ করে যেতে লিখেছেন।"

পিকলুর মুখ-চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সে-কথায়। বলল, "ফ্যাণ্টাসটিক, তোদের দেশ খুব সুন্দর। আর তোর ঠাম্মার দুধপুলি, পাটিসাপটা এককথায় ব্রিলিয়াণ্ট।" বলেই টাগরায় টকাস করে শব্দ করল।

বুকুন বলল. "এক্ষুনি চল ; মাসিমাকে

বলে সব ঠিক করে নি।"

পিকলুর মা বললেন, "বেশ তো যাও। স্কুল খোলার আগেই কিন্তু ফিরে আসবে। মনে রেখো এটা তোমাদের ফাইন্যাল ইয়ার।"

মেসোমশাইয়ের সেদিন অফ-ডে ছিল। উনি শুনে বললেন, "আমি চাই তোমরা বাইরের পৃথিবীটাকে দেখো, চেনো। বইয়ের পোকা হয়ে থাকাটা একদম আমার পছন্দ নয়। কলকাতার ছেলেরা জোনাকি চেনে না, শিয়াল-খাটাসের ডাক শোনেনি, ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গলে কত রকমের পাখি, কত রকমের ডাক, এসব কিছুই জানে না। শুধু বই পড়ে কি গ্রাম আর শহরের তফাত বোঝা যায়। এই তো সময়, প্রাণ ভরে সব দেখে নাও গে।"

পরদিন ওরা ভোরেই তারকেশ্বরের ট্রেন ধরে দেউলগাঁয়ের উদ্দেশে রওনা দিল। ট্রেনে মুখোমুখি বসে জানালায় চোখ রেখে বাইরের সব দৃশ্য অপলকে দেখে নিচ্ছিল ওরা। পিকলু জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁ রে বুকুন, জগা বাঁশিওলা এখনও কি আছে ?"

ম্লান মুখ করে উত্তর দিল বুকুন, "আছে। তবে ও নাকি এখন খুব পাগলামি করে। বাবা তো প্রতি সপ্তাহেই দাদু, ঠাম্মাকে দেখতে যান ; বাবাই তো সেদিন বললেন, ও দিনে ঘুমোয় আর সারারাত জেগে গাঁ পাহারা দেয়। রাতে খুব চেঁচামেচি করে। কেন যে অমন সুন্দর লোকটা পাগল হয়ে গেল !"

পিকলু বলল, "এবার কিন্তু হেঁটে যাব— সাইকেল-রিকশায় যাব না।"

বুকুন জবাব দিল, "তারকেশ্বর পৌঁছুতে বেশ বেলা হবে। তারপর সাত মাইল হেঁটে আমাদের দেউলগাঁ। ঠাম্মা দাদুকে তাড়াতাড়ি না দেখা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না। বুড়ো হয়ে গেছেন তো, প্রত্যেক চিঠিতেই আমি কবে যাচ্ছি লেখেন। বরং ফেরার দিন হেঁটে আসব, কী বলিস ?"

পিকলু রাজি হয়ে গেল সে কথায়। ফসলের খেত দেখতে দেখতে ওরা যখন দেউলগাঁয়ে পৌঁছুল তখন বেলা প্রায় বারোটা। শীতকাল বলেই রোদের তেজ তেমন নেই।

ওরা বাড়িতে ঢুকেই দাদুর মুখোমুখি পড়ে গেল। ইজিচেয়ারে বসে অখিলেশ্বরবাবু গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিলেন।

অখিলেশ্বরবাবু খুশি হয়ে বললেন, "জানিয়ে এলে তোমাদের জন্য পালকি পাঠিয়ে দিতুম।"

পিকলু জানে এখানে এখনও পালকির চল আছে। বড়দের মতো ভঙ্গি করে বলল, "পালকিতে তো মেয়েরা আসা-যাওয়া করে। আমরা কেন আসব।"

অখিলেশ্বরবাবু হেসেই কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন।

বুকুন জিজ্ঞেস করল, "ঠাম্মা কই দাদু ?"

"বাতের ব্যথায় কাতরাচ্ছে দেখো গে যাও।"

পিকলু সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেলল, "বাবা বলেন যোগব্যায়ামে বাত সেরে যায়। বাবাকে একবার ঠিক নিয়ে আসব এখানে।"

"এ বয়সে তোমাদের ঠাম্মা ব্যায়াম করবেন ?" বলেই সামান্য হেসে ফের গম্ভীর হয়ে গেলেন উনি। বুকুন এর মধ্যেই লক্ষ করল দাদু কেমন যেন অন্যমনস্ক। জিজ্ঞেস করল, "তোমাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে দাদু ?"

"তা তো দেখাবেই, আমি বড় দুশ্চিন্তায় পড়েছি যে।"

"কী হয়েছে তোমার দাদু ?"

অখিলেশ্বরবাবু প্রশ্ন করলেন, "আগে বলো তোমাদের রেজাল্ট কেমন হল ?"

পিকলু আর বুকুন একই সঙ্গে উত্তর

দিল, "এবারও আমরা ব্র্যাকেটে থার্ড হয়েছি দাদু।"

অখিলেশ্বরবাবু বললেন, "তা বেশ। তবে কী জান বুকুন, তোমার থেকে পিকলু এক ধাপ এগিয়ে আছে। গত বন্যায় ও যা করেছে তার তুলনা নেই।" পিকলুর পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করলেন উনি। বুকুনকেও বুকের কাছে টেনে এনে বললেন, "আগে তোমরা বিশ্রাম করো, তারপর সব বলব।"

ওরা দেরি না করে ঠাম্মার ঘরে চলে এল। ঠাম্মা ওদের দেখেই ফোকলা মুখে হেসে বললেন, "তোমরা এসেছ বুঝতে পেরেছি কিন্তু কী করব বলো?" একটু উঠবার চেষ্টা করেই 'ওরে মা-রে, গেলুম-রে' বলে কোঁকাতে লাগলেন।

বুকুন বলল, "কেন মিছিমিছি উঠতে যাও। আরেব্বাস, হাঁটুটা যে বেশ ফুলে গেছে ঠাম্মা!"

ঠাম্মা হেসে বললেন, "তোমাদের সোনামুখ দেখলাম, এবার সব সেরে যাবে।" ওরা ঘর থেকেই শুনতে পেল, দাদু বনমালীকে পুকুর থেকে ভাল মাছ ধরে আনতে বলছেন।

বুকুন প্রশ্ন করল, "দাদুর কী হয়েছে ঠাম্মা। আর রান্না-বান্নাই বা কে করছে?"

ঠাম্মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "এ পোড়া দেশে কীসব কাণ্ডকীর্তিই না হচ্ছে। এই তো সেদিন তোমার দাদুর হুঁকোটা বেপাত্তা হয়ে গেল। আমি উঠতে পারি না, তবুও কে যে তুলসীতলায় পিদিম জ্বেলে যায় কে জানে! আর পরশুদিন তো হাঁড়িসুদ্ধ ভাতই চুরি হয়ে গেল। কী কাণ্ড, পরদিনই হাঁড়িটা মেজে ঘষে ফেরত দিয়ে গেছে। মনে হয়, এ সবই ভুতুড়ে কাণ্ড। রান্না-বান্না বনমালীই করছে।"

পিকলু গম্ভীর গলায় বলল, "এ-সবই জানাশোনা লোকের কাজ। ভূত-ফুতে আমি বিশ্বাসই করি না। ফ্যাণ্টাসটিক, ভাগ্যিস এসেছিলাম, এসব রহস্যের কিনারা করে কলকাতায় ফিরে বাবা-মাকে তাক লাগিয়ে দেব।"

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিশ্রাম নিয়ে ওরা বিকেলের দিকে বেড়াতে বেরুল। গল্প করতে করতে ওরা পুরনো শিবমন্দিরের কাছে এসে হাজির হল। সন্ধে হয়ে আসছে বলেই ওরা জঙ্গলের ভেতর ঢুকে শিবমন্দিরের কাছে গেল না।

বাড়ি এসে বুকুন দাদুকে বলল, "তোমার দুশ্চিন্তার কী কারণ তা আমরা ঠাম্মার কাছ থেকে জেনে গেছি।"

পরদিন সকালে চিৎকার-চেঁচামেচিতে ওদের ঘুম ভাঙল। ওরা ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখে, একজন বুড়ো গাঁসুদ্ধ লোককে চোর বলে গাল দিচ্ছে।

কাছে এগিয়ে এসে বুকুন জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে দক্ষিণাদাদু?"

"আর বলো কেন বাবা, আমার তিনটে হাঁসের দুটোকেই পাওয়া যাচ্ছে না।"

ভিড় থেকে সরে এসে পিকলু বুকুনকে বলল, "আজই আমরা অ্যাকশনে বেরুব।" বুকুন 'অ্যাকশন' কথাটার ভেতরে রহস্যের গন্ধ পেল।

দাদুকে কিছুই জানাল না। ওরা গভীর রাতে টর্চ আর বেতের লাঠি নিয়ে বেরুল। বাইরে থেকে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। এদিক-ওদিক বেশ কিছুক্ষণ ঘুরল। অস্বাভাবিক কোনো কিছুই ওদের নজরে পড়ল না। ওরা বেড়াল-পায়ে ফিরে এসে শুয়ে পড়ল। পরদিনও ওরা তাই করল। সেদিনও নিরাশ হয়ে ফিরে এল। রোজই বেশ কিছুক্ষণ গল্প করে ঘুমোতে যায়। ঘড়িতে যেই ঢং-ঢং করে বারোটার ঘণ্টা বাজে ওরা নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ে। আজও তাই করল ওরা। বীরেন দাস দেউলগাঁয়ের খুব নামী ডাক্তার। গরিব-দুঃখীর জন্য খুব

দয়া-মায়া। ওঁর বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটা বড় পুকুর আছে। পুকুরের কাছাকাছি আসতেই পিকলু বুকুনকে সতর্ক করল। বাঁশঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে ওরা দুজন আবছা মানুষের চেহারা দেখতে পেল। আজ আকাশে চাঁদ নেই। বেশ মেঘলা-মেঘলা।

বুকুন বলল, "মুখোশ পরে রয়েছে রে পিকলু।" বলেই পাঁচ ব্যাটারির টর্চ জ্বেলে দিল। আলো পড়তেই লোক দুটো ভীষণ ঘাবড়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে পিকলু ওর জাঠদের মতো শরীর নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লোকদুটোর ওপর। বুকুনও দৌড়ে প্রথমেই ওদের মুখোশ খুলে ফেলল। দেখল, লোকদুটো ওদের গাঁয়েরই— সনাতন আর লতিফ।

বুকুন জিজ্ঞেস করল, "আরে তোমরা ?"

যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে ওরা একসঙ্গেই উত্তর দিল, "হ্যাঁ দাদাবাবু।"

পিকলু বলল, "এদের চিনিস দেখছি ?"

বুকুন বলল, "এরা তো এ গাঁয়ের হরবোলা।"

পিকুল গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল ওদের, "এসব ভুতুড়ে কাণ্ড তোমরাই করছ তাহলে ?"

তার উত্তর না দিয়ে সনাতন হেসে বলল, "কবে এলে দাদাবাবু ?"

বুকুন পুলিশি মেজাজে বলে উঠল, "চোপ্। আগে বলো, দাদুর হুঁকো কে চুরি করেছে ? আর তুলসীতলায়ই বা কে পিদিম জ্বালে ?"

সনাতন বলল, "পিদিম আমি জ্বালি দাদাবাবু। মা-ঠাকরুনের শরীর খারাপ, পিদিম জ্বলবে না জেনে, এ কাজ আমিই করি।"

"আর হুঁকো ?"

লতিফ বলল, "বাবু যখন ভুড়ুক-ভুড়ুক তামাক টানে কী সুন্দর গন্ধ বেরোয়। লোভ সামলাতে না পেরে ওটা আমি চুরি করেছি। ফেরত দেব কী করে, ওতে যে আমরা মুখ লাগিয়েছি।"

"আর ভাতের হাঁড়ি।"

লতিফ উত্তর দিল, "ওটাও আমার কাজ। কী করি কন ? জুড়ানের ছেলেমেয়েরা দুদিন না খেয়ে আছে। ওদের কান্না শুনলে প্রাণ ফেটে যায়। তাই····।"

পিকলু বলল, "আজ আবার মাছ চুরি করছ কেন ?"

সনাতন বলল, "জগা ক'দিন ধরে জ্বরে ভুগছিল। কাল থেকে জ্বর নেই। খালি মাছ খাব, মাছ খাব করছে। কিনে তো আর খাওয়াতে পারব না, তাই····· আর ওই দক্ষিণাবাবুর হাঁস আমরাই চুরি করেছি। একটা ডিম চেয়েছিলাম জগার জন্য। তা আমাদের গালাগাল দিয়ে তাড়িয়ে দিল। শীতে হাঁসের মাংস খুব সুস্বাদু হয় দাদাবাবু।"

বুকুন বলল, "এ মা, হাঁস দুটোকে কেটে ফেলেছ তোমরা ?"

লতিফ উত্তর দিল, "না দাদাবাবু, বৈকুণ্ঠপুরে মাসির বাড়ি রেখে এসেছি।"

অখিলেশ্বর সব শুনে খুব হাসলেন। বললেন, "তোরা দেখছি খুব পরোপকারী চোর। হ্যাঁ রে, চুরি করে কি কখনও কাউকে উপকার করা যায় ?"

সনাতন আর লতিফ চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। পরে সনাতন বলে, "সিধে কথায় কেউ বিশ্বাস করে না যে !"

অখিলেশ্বরবাবু বললেন, "আজ থেকে তোরা আমার জমি-জায়গা দেখবি, কেমন ? এই টাকা দিচ্ছি, মাংস কিনে আনগে। একসঙ্গে বসে খাব। বুঝলি ?"

ওরা মাংস কিনতে বাজারে চলে গেল।

অখিলেশ্বরবাবু বুকুন আর পিকলুর পিঠ চাপড়ে বললেন, "শাবাশ !"

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

বসু-বাড়ি

শিশিরকুমার বসু

(৭৩)

ভিয়েনা থেকে প্যারিস ট্রেনে চব্বিশ ঘণ্টার পথ। ইউরোপের একটা বিখ্যাত ট্রেন ছিল ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস। যুদ্ধের আগে প্যারিস থেকে তুরস্কের রাজধানী ইস্তামবুল পর্যন্ত পাড়ি দিত। এখন ভিয়েনার পর আর যায় না। এক সকালে আমরা ঐ ট্রেনে ভিয়েনা থেকে রওনা হলাম। ভিয়েনাতে আমাদের মালপত্র অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছিল। শৌখিন সব রকম জিনিসপত্রে বাবার খুব শখ। খবর পেলেন যে ভিয়েনার কোনো এক নবাব-পরিবারের অতি উৎকৃষ্ট চিনামাটির বাসনপত্র বিক্রি হচ্ছে। দেখে পছন্দ হয়ে গেল এবং বাসনের এক বিরাট বহর কিনে ফেললেন। ভিয়েনাতে সেগুলি একসঙ্গে প্যাক করানো সম্ভব হল না। সুতরাং অসংখ্য বাক্সে সেগুলি ভরে নিয়ে আমরা ট্রেনে চাপলাম। পুরো যাত্রাটা আমরা সকলে বাক্স-পরিবৃত হয়ে রইলাম, মাথার ওপরে পায়ের নীচে দুপাশে কেবলই বাক্স। প্যারিস পৌঁছে বাসনপত্রগুলি জাহাজে করে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা হল।

প্যারিস ইউরোপের প্রথম সারির শহরগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে অনেকে মনে করেন—ইতিহাসে, ভাস্কর্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে ও সাহিত্যে। ভিয়েনা ও প্যারিসের ঐতিহাসিক মিউজিয়ামগুলি দেখার পরই কলকাতায় ঐ ধরনের মিউজিয়াম গড়ে তোলার স্বপ্ন আমি দেখতে আরম্ভ করি। বিশেষ করে প্যারিসের কাছেই ভার্সাইয়ে নেপোলিয়নের জিনিসপত্রের সংগ্রহশালা দেখে আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছিলাম।

প্যারিসের মতো ঐতিহ্যপূর্ণ শহরে 'সাইট-সিয়িং' করতে করতে বেশ ইতিহাস পড়া হয়ে যায়। আমাদেরও তাই হল। তাছাড়া আমাদের দেশের সাম্প্রতিক ইতিহাসের অনেক সূত্র ধরে আমরা খোঁজখবর করতে লাগলাম। এমন বর্ষীয়ান দু-চারজনকে পাওয়া গেল যাঁরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইউরোপে আমাদের বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পরে এঁরাই আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাঙাকাকাবাবুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন।

ফ্রান্সের বিখ্যাত দার্শনিক ও লেখক রোমা রোলাঁর সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর সুইজারল্যাণ্ডে দেখা হয় ১৯৩৫ সালে। রোলাঁ ছিলেন সাধক প্রকৃতির লোক এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে ও দর্শনে ছিল তাঁর গভীর অনুরাগ। তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী লিখেছিলেন। তিরিশের দশকে যে কয়েকজন ইউরোপীয় মনীষীর সঙ্গে রাঙাকাকাবাবুর হৃদ্যতা হয়েছিল তাঁদের একজন ছিলেন রোলাঁ। বাবাও ছিলেন রোলাঁর ভক্ত। মনে আছে, রোলাঁর লেখা খানদুয়েক বই কার্শিয়াংয়ে অন্তরিন থাকার সময় তিনি আমাকে পড়িয়েছিলেন।

খবর পাওয়া গেল রোলাঁর স্ত্রী প্যারিসে আছেন। বাবার সঙ্গে আমরা একদিন তাঁর ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি বললেন যে, রোলাঁ নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন এবং সেগুলি সযত্নে রাখা হয়েছে, ভাল করে

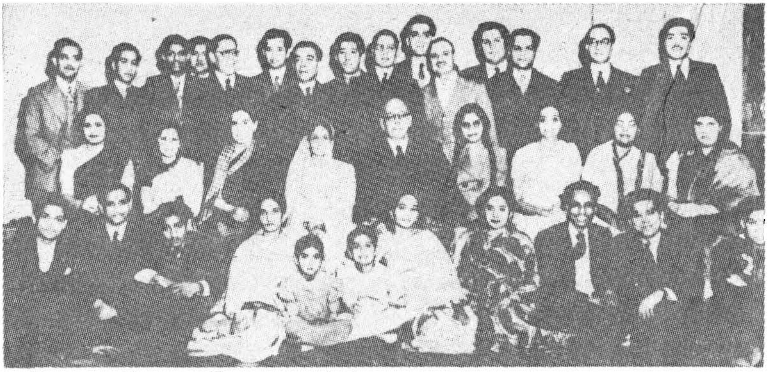

ডাবলিনের ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আমরা

সম্পাদনা করে প্রকাশ করা হবে। বছর-কয়েক বাদে রোমে রোলাঁর ডায়েরি বইয়ের আকারে প্রকাশিত হলে দেখলাম, রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা তিনি খুব সুন্দর করে লিখে রেখেছেন। এক প্রবীণ ইউরোপীয় চিন্তাবিদ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কনিষ্ঠতম নেতাকে কী চোখে দেখেছিলেন সেটা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। সুভাষচন্দ্রকে তাঁর মনে হয়েছিল গভীরভাবে চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান—তাঁর বই পড়ে রোলাঁর আগেই এই ধারণা হয়েছিল। রোলাঁর মতে রাঙাকাকাবাবু তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি একজন সত্যিকারের রাষ্ট্রনীতিবিদ যিনি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে ঘটনাপ্রবাহ বিচার করতে পারেন। রাঙাকাকাবাবু তাঁকে খোলাখুলিভাবে বলেছিলেন যে, দরকার হলে তিনি সশস্ত্র প্রতিরোধের পথ নিতে প্রস্তুত আছেন। আরও বলেছিলেন যে, বিশ্বযুদ্ধ ভারতকে স্বাধীনতা অর্জনের ভাল সুযোগ এনে দিতে পারে। রোমে রোলাঁর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার ভিত্তিতে একটি প্রবন্ধ রাঙাকাকাবাবু ১৯৩৫ সালে প্রকাশ করেছিলেন।

আগে কখনও অপেরা দেখিনি। সকলে মিলে প্যারিসের বিশ্ববিখ্যাত ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব মিউজিক-এ গেলাম। পৌঁছতে কিছু দেরি হয়ে গিয়েছিল। অপেরা শুরু হয়ে গিয়েছে। অপেক্ষা করতে হল। ইউরোপীয় সঙ্গীত বা নাচের অনুষ্ঠানে যখন-তখন ঢোকা যায় না। বিরতির জন্য অপেক্ষা করতে হয় যাতে অনুষ্ঠানের কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। যখন অনুষ্ঠান চলতে থাকে কেউ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করে না।

আমরা যখন প্যারিসে তখন সেখানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশন চলছে। রাশিয়ার প্রতিনিধিদলের নেতা আঁদ্রে ভিশিনস্কি বেশ আসর গরম করে রেখেছেন। তিনি ছিলেন আইনজ্ঞ ও সুবক্তা। বাবা ওঁর বক্তৃতা শুনতে খুবই উৎসুক ছিলেন। দর্শক-টিকিটের ব্যবস্থা হল এবং আমরা সকলে মিলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের অধিবেশনের এক প্রস্থ শুনে এলাম। ভিশিনস্কি রুশ ভাষায় বলছিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি তর্জমার ব্যবস্থা ছিল। আমরা ইয়ারফোন লাগিয়ে তাঁর বক্তৃতার ইংরেজি বয়ান শুনলাম। এক নতুন অভিজ্ঞতা হল।

প্যারিস থেকে আমরা যাব আয়ারল্যাণ্ডের রাজধানী ডাবলিনে। আয়ারল্যাণ্ডের সঙ্গে আমাদের এক বিশেষ

সম্পর্ক। তাঁরা আমাদের সংগ্রাম-সাথী। একই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে তাঁরা স্বাধীন হয়েছেন। রাঙাকাকাবাবু ১৯৩৬-এর গোড়ায় ঐ দেশে গিয়েছিলেন। ভারত ও আয়ারল্যাণ্ডের মধ্যে নতুন করে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। রাঙাকাকাবাবু দুঃখ করে বলতেন, কত ভারতীয় লণ্ডনে যায় কিন্তু ডাবলিনে যায় না। সেখানে গেলে যাঁরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন এবং এখনও করে চলেছেন এমন সব নরনারীকে তাঁরা রক্তমাংসে প্রত্যক্ষ করতে পারবেন।

১৯৩৬-এ রাঙাকাকাবাবু ফ্রান্স থেকেই আয়ারল্যাণ্ড গিয়েছিলেন। আমরাও সেইভাবে গেলাম। জাহাজ থেকে নেমে তিনি প্রথমেই যান কর্ক শহরে। কর্কের মেয়র টেরেন্স ম্যাকসুইনি আমাদের যতীন দাসের মতো ইংরেজদের জেলে অনশন করে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। রাঙাকাকাবাবু ম্যাকসুইনির সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং শহীদদের পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা করে তাঁর আয়ারল্যাণ্ডের সফর আরম্ভ করেছিলেন। আমাদের কর্কে যাওয়া হয়নি। কারণ, আমরা আকাশপথে গিয়ে সোজা ডাবলিনে নেমেছিলাম। ডাবলিনে রাঙাকাকাবাবুর সঙ্গে ডি ভ্যালেরার তিনবার দেখা ও আলাপ-আলোচনা হয়েছিল। ডি ভ্যালেরা তখন আয়ারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি। এক বছর আগেই তিনি রাঙাকাকাবাবুর বই 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' পড়েছিলেন। অন্য দিকে আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতাযুদ্ধের সব কথা ও খবর রাঙাকাকাবাবুর নখদর্পণে ছিল। সুতরাং আগে দেখা না হলেও দুজনের মধ্যে আত্মিক যোগ ছিল বলা যায়।

রাঙাকাকাবাবুর কাছে রোমা রোলাঁর শুভেচ্ছা বাণী

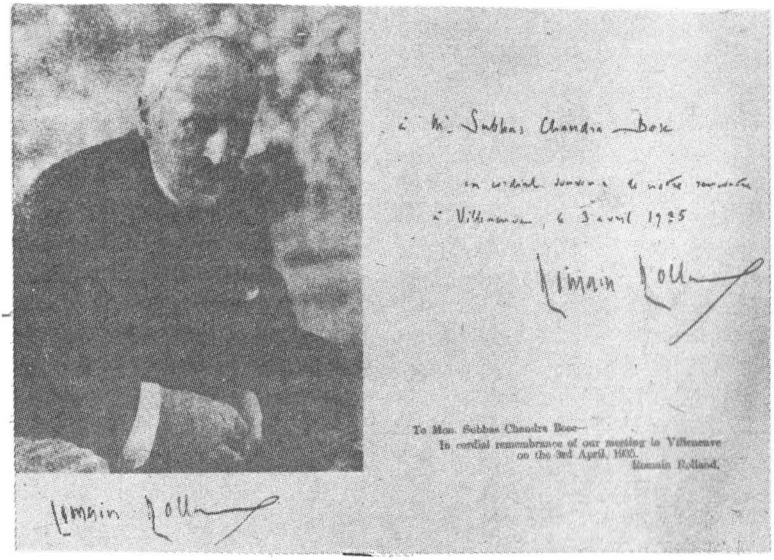

ইণ্ডিয়ান-আইরিশ ইণ্ডিপেণ্ডেস্ লিগ রাঙাকাকাবাবুর সম্মানে এক বিরাট সভার আয়োজন করেছিলেন। সভানেত্রী ছিলেন ম্যাডাম গন্ ম্যাকব্রাইড। ধন্যবাদ দিতে উঠে অ্যালেক্স লিগ সুন্দর এক মন্তব্য করেছিলেন। বলেছিলেন, কবে ডাবলিন শহরের কলকাতার মতো সৌভাগ্য হবে যে, ডাবলিনের মেয়রকে গ্রেট ব্রিটেনে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সেই সময় কলকাতার প্রাক্তন মেয়র সুভাষচন্দ্রকে ইংল্যাণ্ডে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

জানুয়ারির কনকনে শীতের মধ্যে আমরা ডাবলিনে পৌঁছলাম। ইউরোপের অন্যান্য শহরের তুলনায় সেখানকার ঘরবাড়ি একটু পুরনো ধরনের বলে মনে হল, সাধারণভাবে চাকচিক্য কম। তবে লোকজনের ব্যবহার বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ।

ডি ভ্যালেরা বাবার সঙ্গে 'ডয়েল' বা পার্লামেণ্ট হাউসে দেখা করলেন। সঙ্গে আমরাও ছিলাম। অনেক কথা হল। রাঙাকাকাবাবুর কথা ডি ভ্যালেরা গভীর আবেগের সঙ্গে স্মরণ করলেন। আমি যথারীতি ছবিটবি তুললাম। তাঁর সই করা একখানা ছবি যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

ম্যাডাম গন ম্যাকব্রাইড তাঁর বাড়িতে আমাদের চায়ের নেমন্তন্ন করলেন। আমরা আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐ মহীয়সী মহিলাকে দেখবার জন্য খুবই উদ্‌গ্রীব ছিলাম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধেরও আগে ছাত্রাবস্থায় প্যারিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ম্যাডাম গন তখন সেখানে নির্বাসনে ছিলেন। ম্যাডাম গনকে দেখে আমরা মুগ্ধ হলাম। অনেক বয়স হয়েছে কিন্তু কথাবার্তা খুব পরিষ্কার ও তীক্ষ্ণ, চোখ দুটি উজ্জ্বল ও মুখে হাসি লেগেই আছে। মনে হল দুই বন্ধুদেশের দুই স্বাধীনতাসংগ্রামী-পরিবারের এক মিলন-অনুষ্ঠান হচ্ছে। তাঁর পরিবারবর্গের মধ্যে ছিলেন শোন ম্যাকব্রাইড যিনি তখন আয়ারল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী। ম্যাডাম গনের একটি কথা বেশ মনে আছে। বলেছিলেন, দেখ, আমরা এই দুই দেশের লোক স্বাধীনভাবে সাধারণ সুখী জীবনযাপন করতে চাই। ধনদৌলতের আতিশয্য চাই না, বিলাসিতাও চাই না, এটাই বড় কথা, নয় কি ?

আয়ারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি শোন ও-কেলি বাবাকে রাষ্ট্রপতিভবনে আমন্ত্রণ জানালেন। ঠিক সেই সময়েই বাবা ডাবলিনের প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের নেমন্তন্ন করে বসে আছেন। অতিথিদের স্বাগত জানাবার জন্য আমি হোটেলে থেকে গেলাম। রাষ্ট্রপতি দর্শন হল না। রাষ্ট্রপতি ও-কেলি ছিলেন এক প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা এবং রাঙাকাকাবাবুর প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল। প্রথমেই বাবাকে বললেন যে, ভারতের বসু-পরিবারের যে কোনো ব্যক্তির জন্য আয়ারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রপতি-ভবনের দরজা সব সময়েই খোলা। রাষ্ট্রপতি নিজেই ঘুরে ঘুরে রাষ্ট্রপতি-ভবনটি দেখালেন। তিনি নিজে এক কোণে দুটি ঘর নিয়ে থাকেন, বাড়িটির বড়-বড় ঘরগুলি জুড়ে আছে একটি সংগ্রহশালা, যেখানে আয়ারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-যুদ্ধের বীরদের বড়-বড় ছবি সারি-সারি টাঙানো রয়েছে।

ডাবলিনের ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আমাদের মিলন-সন্ধ্যাটি বেশ ভালই কাটল। এর পরে আমরা যাব আমাদের শেষ গন্তব্যস্থান লণ্ডনে। সকালে যখন প্লেন ছাড়ল তখন আকাশ মোটামুটি পরিষ্কার কিন্তু লণ্ডনের ওপরে এসে আমরা ক্রমাগতই ঘুরপাক খেতে লাগলাম। এত ঘন কুয়াশা যে, প্লেন নামতেই পারছিল না। বাইরে এসে দেখি চারিদিক ঘন অন্ধকার ও ঝির-ঝির বৃষ্টি। এই হল লণ্ডন।

(ক্রমশ)

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
পেনাল্টি...
গোল শোধ !
আঃ, দারুণ শট্ !
মার্ভিনের মুখে হাসি ফুটেছে !
আর-একখানা গোল দিতে হবে না ?
কে ঠেকাচ্ছে তোমাকে ?
মাঝমাঠে বল পেয়েছে রয় !
আবার মার্ভিনকে দিল !
জার্মান-ব্যূহ তছনছ !
মার্ভিন এবার...
নাও, রয় !
চমৎকার পাস !
দারুণ লব্ করেছে !
আঃ !
গো-ও-ও-ল !
রাসবুর্গ ১, রোভার্স ২
সঙ্গে-সঙ্গে বাজল খেলাশেষের বাঁশি...
কপাল ঠুকে মার্ভিনকে নামিয়েছিলে, তাই না ?
কিন্তু ঠকব না, তা জানতুম !
প্যাকোকে আমিই লাগিয়েছিলুম ওর পিছনে !
বটে ?
প্যাকো ওকে এমন রাগিয়ে দিয়েছিল যে, ভাল না-খেলে ওর উপায় ছিল না !

সব শুনে মার্ভিন তো স্তম্ভিত !
তার মানে আসলে তুমি আমাকে সাহায্যই করছিলে প্যাকো ?
নিশ্চয়ই !
দলকে ভালবাসি বলেই এ-কাজ করেছি !
ফিরতি-খেলাতেও রোভার্সই জিতবে । আর তখন আমি সবচেয়ে জোরে হাততালি দেব !
ফিরতি খেলাতেও রোভার্সই জিতল !
আঃ, গোলার মতো শট !
আর মাত্র দশ মিনিট বাকি !
বৃষ্টির মধ্যে কাপ নিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ করছে রোভার্স দল...
বাস, কাজ শেষ, এবারে আমি বসরানে যাব !
আমরা তোমার সঙ্গে যেতে চাই !
বসরানে যেতে শেষ পর্যন্ত রাজি করানো গেছে রয়কে !
দেখি কেমন লাগে !
চিঠি দিও কিন্তু !
স্ত্রী-পুত্র নিয়ে বসরানে চলেছে রয়...
শেখ দেখছি তাঁর প্লেন পাঠিয়েছেন ।
তাই তো !
বসরানের বিমানবন্দরে...
ওই আসছে রয়ের প্লেন । আর ভাবনা নেই !
ফুটবলে এবারে আমরা বিশ্ববিজয়ী হব !
রয়কে আর ফিরতে দেব না !
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)
শেখের কথায় কিসের ইঙ্গিত

আজ্ঞে, নদী ফুলেছে।
নদী ফুলেছে ! তার মানে ?
আজ্ঞে, নদীতে ঢল নেমেছে। পাহাড়ে বৃষ্টি হয়েছিল কিনা।
তাই নাকি ? চল তো দেখি।
নদীর ধারে এসে দাঁড়াল সদাশিব আর দুই বিজাপুরী ফৌজদার···

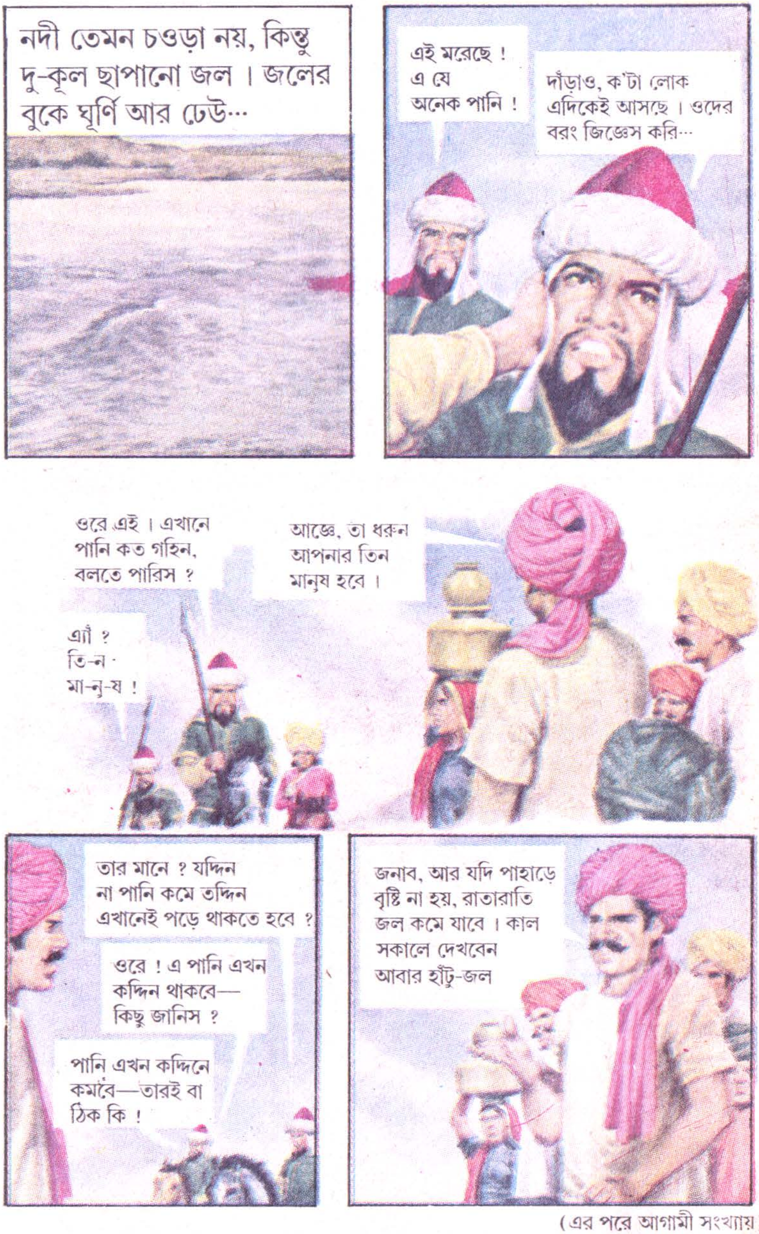

চিত্রনাট্য : তরুণ মজুমদার ছবি : বিমল দাশ

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

লন্ডনের লঙ্কাকাণ্ড

আরতি দাস

বহু বছর আগেকার কথা বলছি। ১৬৬৬-র সেপ্টেম্বর মাস। দ্বিতীয় চার্লস্ তখন ইংল্যান্ডের রাজা। পুডিং লেনের জন ফোরিনারের দোকানের রুটি খেতেন রাজা চার্ল্স। রাজার পছন্দসই রুটি তৈরি করত বলে ফোরিনারের রুটির চাহিদাও ছিল খুব বেশি। লোকের কাছে গর্ব করে ফোরিনার বলতেন, "বুঝলে হে, আমার দোকানের রুটি না হলে রাজার চলে না।" খুব যত্ন করে রুটি বানাতেন ফোরিনার।

পুডিং লেনের বাড়ির একতলায় ফোরিনারের বেকারি। দোতলায় ওর শোবার ঘর। সেপ্টেম্বরের পয়লা তারিখ খদ্দেরের ভিড়টা কিছু বেশি। সারাদিন খুব খাটনি গেছে। সন্ধেবেলায় ক্লান্ত ফোরিনার নীচের কাজ সেরে ওপরের ঘরে চলে এলেন। তারপর ঝুপ্ করে শুয়ে পড়লেন বিছানায়। আর শোওয়ামাত্র গভীর ঘুম।

তাড়াহুড়ো করে বেকারির চুল্লি নেবানোর সময় ফোরিনার লক্ষই করেননি যে, চুল্লির ভেতরে এক টুকরো ধিকি-ধিকি আগুন ছিল। সেই আগুন একটু-একটু করে বেড়ে উঠে একসময় ছড়িয়ে পড়ল ঘরের ভেতর।

ফোরিনার যখন ওপরের ঘরে গভীর ঘুমে অচৈতন্য তখন নীচের তলায় দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ল পাশের এক হোটেলে। হোটেলের নাম স্টার-ইন। লন্ডনের লোকদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, সেই হোটেলের উঠোনে ছিল বিশাল এক খড়ের গাদা। দু-চারটে আগুনের ফুল্‌কি হাওয়ায় উড়ে এসে খড়ের গাদায় পড়তেই দাউ-দাউ

করে আগুন জ্বলে উঠল। আর সেই আগুন আশপাশের বাড়ি-ঘরে ছড়িয়ে পড়তে একটুও দেরি হল না।

তখনকার দিনে পুডিং লেনের কাছে অনেকটা জায়গা জুড়ে ঢালাও বস্তি ছিল। গায়ে-গায়ে লাগানো বাড়ি-ঘর আর দোকানপাট। দেখতে দেখতে সারা মহল্লায় আগুন ছড়িয়ে পড়ল। পাড়া-পড়শিদের চিৎকারে ঘুম ভাঙতে বাইরে এসে থ' হয়ে গেলেন ফোরিনার। আগুন তখন আয়ত্তের বাইরে। লোকজন ছুটে পালাচ্ছে ভয়ে। আগুন নেবানোর কোনো চেষ্টাই কেউ করছে না। সময়ও নেই।

সে-সময় লন্ডন শহরের এখানে-সেখানে প্রায়ই আগুন লাগত। রাজার লোকজন এসে নিবিয়ে দিত সে আগুন। লন্ডনের মেয়রকে ডেকে রাজা সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন : আগুন নিয়ে এ-রকম ঢিলেঢালা ভাব আর চলবে না। এ-ব্যাপারে খুব কড়া নিয়ম-কানুন চালু করতে হবে। কিন্তু পুডিং লেনের আগুনের খবর পেয়ে লন্ডনের মেয়র যখন ছুটে এলেন তখন ভোর হয়েছে।

ধুস, ও আবার একটা আগুন নাকি! ইচ্ছে করলে যে-কেউ নেবাতে পারে। এই কথা বলে মেয়রমশাই চলে গেলেন। ফলে, অবাধে ছড়াতে থাকল আগুন। পুডিং লেনের খুব কাছেই ছিল এক বাজার। সেই বাজারের গুদামে আগুন লাগল। লকলকে শিখা আর ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল ওদিকের আকাশ।

খুব সাঙ্ঘাতিক কোনো বিপদ না ঘটলে রবিবার রাজাকে কেউ বিরক্ত করতে চায় না। এ দিনটা রবিবার হওয়ায় রাজার কাছে কোনো খবরই পৌঁছল না। এদিকে জ্বলন্ত টিন, কাঠ ছড়িয়ে পড়ছে, আর একের পর এক মহল্লায় আগুন ধরে যাচ্ছে।

পুডিং লেন মোড় নিয়েছে বড় রাস্তায়। সে রাস্তাটা সোজা লন্ডন ব্রিজের ওপর দিয়ে টেম্‌স নদীর ওপারে চলে গেছে। রবিবার সন্ধেয় লন্ডন ব্রিজের ওপরের দোকানগুলিতে আগুন লেগে গেল। তারপরেই এক ধুন্ধুমার কাণ্ড।

টেম্‌সের পাড়েই বিশাল সব গুদামঘর। গুদামভর্তি কাঠ কয়লা আর তেলের পিপে। আগুন গুদামঘরগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই এক সর্বনেশে ব্যাপার হল। এক-একটা তেলের পিপেয় আগুন ধরে গিয়ে ফাটছিল, আর প্রচণ্ড আওয়াজে লন্ডন শহরের মানুষ চমকে-চমকে উঠছিল।

পরদিন আগুন লাগার খবর গেল রাজার কানে। তারপর আগুন নেবানোর চেষ্টা শুরু হল পুরোদমে। পুরো চারদিন ধরে এই বিষম লঙ্কাকাণ্ড চলল লন্ডন শহরে।

কত যে বাড়ি-ঘর, দোকানপাট পুড়ল তার আর হিসেব নেই। সাতাশিটা গির্জা মাটিতে মিশে গেল। লন্ডনের গিল্ড হল রয়্যাল এক্সচেন্জের বিল্ডিং পুড়ে ছাই। আগুনের ভয়ংকর তাপে সেন্ট পল্‌স গির্জার পাথরের দেওয়াল চৌচির হয়ে গেল। গির্জার পুরনো কবরগুলির গাঁথনি ফেটে গিয়ে ছিটকে গিয়েছিল চারদিকে। আর, গির্জার ছাত গলে গিয়ে গরম সিসের স্রোত বয়ে গিয়েছিল আশপাশের রাস্তায়।

সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা, এই ভয়ংকর আগুনে মারা গিয়েছিল মাত্র আটজন।

জন ফোরিনারের সামান্য একটু গাফিলতির জন্য, লন্ডন শহরের লোকদের বিরাট এক খেসারত দিতে হল।

তবে, দুটি কারণে লন্ডনের অগ্নিকাণ্ড শাপে বর হয়েছিল। প্রথমত, শহরের মাঝখানের বিশাল বস্তি পুড়ে নিশ্চিহ্ন হওয়ায় সুন্দরভাবে শহর গড়ার সুযোগ পাওয়া গেল। দ্বিতীয়ত ১৬৬৫-তে লন্ডনে যে প্লেগের মড়ক লেগেছিল, তার শেষ জীবাণুও আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ায় শহর প্লেগমুক্ত হল।

ছবি : দেবাশিস দেব

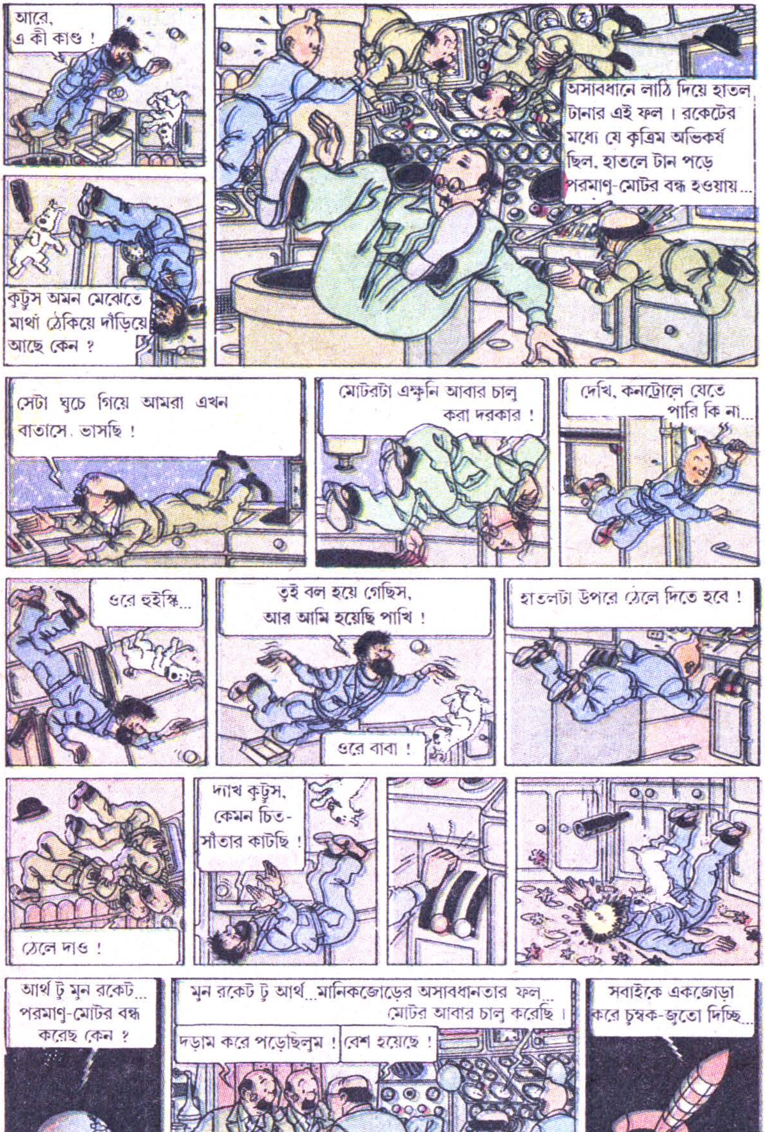

আরে, এ কী কাণ্ড !
কুট্টুস অমন মেঝেতে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেন ?
অসাবধানে লাঠি দিয়ে হাতল টানার এই ফল । রকেটের মধ্যে যে কৃত্রিম অভিকর্ষ ছিল, হাতলে টান পড়ে পরমাণু-মোটর বন্ধ হওয়ায়...
সেটা ঘুচে গিয়ে আমরা এখন বাতাসে ভাসছি !
মোটরটা এক্ষুনি আবার চালু করা দরকার !
দেখি, কনট্রোলে যেতে পারি কি না...
ওরে হুইস্কি...
তুই বল হয়ে গেছিস, আর আমি হয়েছি পাখি !
ওরে বাবা !
হাতলটা উপরে ঠেলে দিতে হবে !
ঠেলে দাও !
দ্যাখ কুট্টুস, কেমন চিত-সাঁতার কাটছি !
আর্থ টু মুন রকেট... পরমাণু-মোটর বন্ধ করেছ কেন ?
মুন রকেট টু আর্থ...মানিকজোড়ের অসাবধানতার ফল... মোটর আবার চালু করেছি ।
দড়াম করে পড়েছিলুম !
বেশ হয়েছে !
সবাইকে একজোড়া করে চুম্বক-জুতো দিচ্ছি...

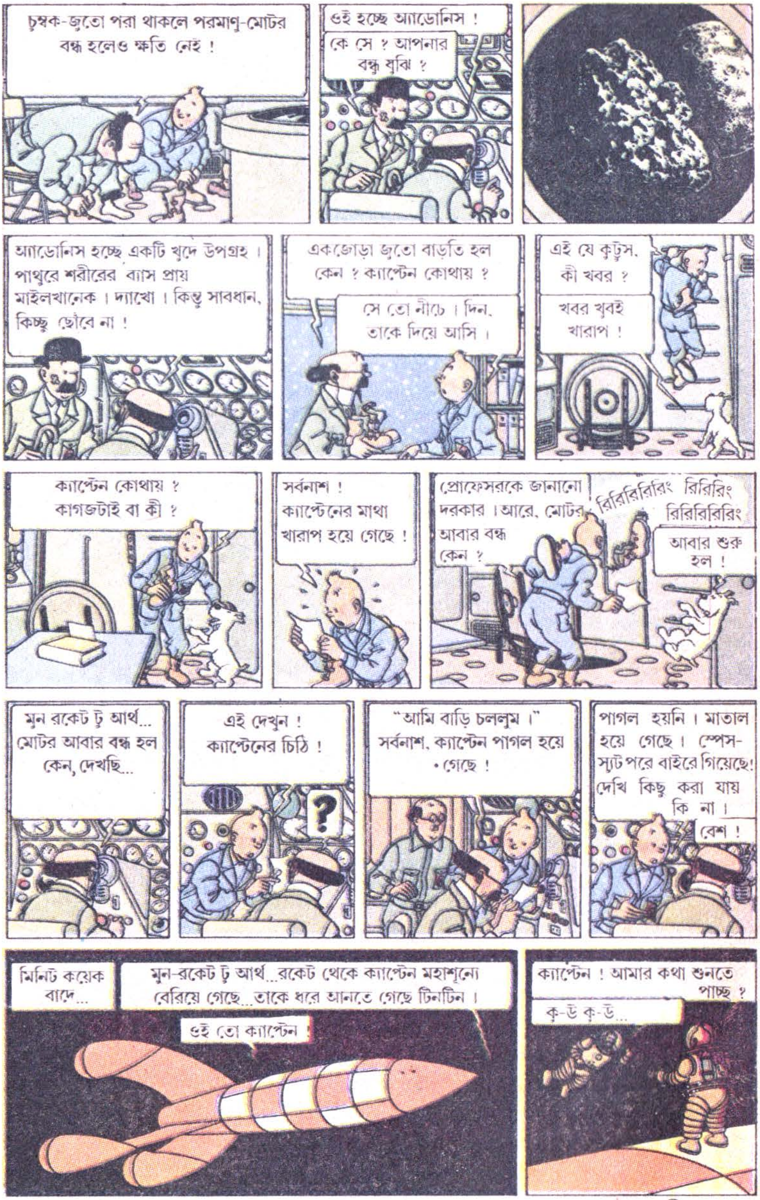

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

একটি পুষ্টিকর সম্পূর্ণ শিশু আহারে থাকা উচিৎ
সব কটি পুষ্টিকর উপাদান ঠিক ঠিক পরিমাণে...

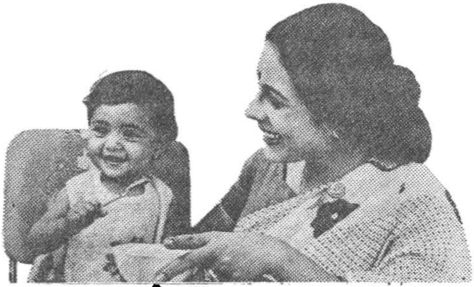

সেরেল্যাক
একটি পুষ্টিকর সম্পূর্ণ শিশু আহার
—যা অত্যন্ত সুস্বাদু

যখন আপনার বাচ্চার বয়েস প্রায় চার মাস আর সে শক্ত খাবার খেতে তৈরী তখন, সেরেল্যাক সম্বন্ধে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন। প্রতিবার সেরেল্যাক খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার বাচ্চার সম্পূর্ণ পুষ্টিকর খাবার পড়ছে জেনে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন।

অর্থাৎ, শক্ত আহারের মাধ্যমে বাচ্চার যে পরিমাণ প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান, প্রোটিন ও ক্যালোরী পাওয়া উচিৎ তা আছে সেরেল্যাকে। বাচ্চার পরিপূর্ণ পুষ্টির জন্যে আপনাকে আর অন্য কোনও খাবার দিতে হবেনা।

পুষ্টি ও স্বাদে ভরপুর সেরেল্যাকে আছে গমের আটা, মালাইদার দুধ ও চিনির এক সুস্বাদু মিশ্রণ। সেরেল্যাকে আছে শরীর গঠনের উপযোগী প্রোটিন, প্রাণচঞ্চল শক্তির জন্যে কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট আর সুস্থ-সবল বেড়ে উঠার জন্যে প্রয়োজনীয় সব রকমের ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ।

আপনার বাচ্চার সম্পূর্ণ, স্বাভাবিক সুস্বাস্থ্যের জন্যে তাকে সেরেল্যাক দিন!

সেরেল্যাক®
এতে দুধ মেশানো আছে

সেরেল্যাক তৈরী করে নেওয়া কি সোজা! অনুপাত মাপে ফোটানো কুসুম-গরম জল ঢালুন! মিশিয়ে দিন, নাড়ুন আর খেতে দিন।

SAA'FSL/C/2670 BEN

NESTLÉ

রুআহা

বুদ্ধদেব গুহ

আগে যা ঘটেছে : পুব আফ্রিকায় পশু-চোরাইচক্রের সন্ধানে এসেছে ঋজুদা, রুদ্র ও তিতির। পুরনো শত্রু ভুষুণ্ডার দেখা মিলেছে। আরুশার হোটেলে আচমকা হত্যাকাণ্ড। নাইরোবি-সর্দারি ও দুই সাহেবের সঙ্গে ঋজুদার গোপন পরামর্শ। ওয়ানাবেরি নামে এক নিগ্রো দম-বন্ধ-করা কাহিনী শোনায়। গোপন অভিযানে ওরা রুআহা ন্যাশনাল পার্ক পেরিয়ে পাহাড়ি অঞ্চলে তাঁবু ফেলে। সেখানে নানান উৎপাত, যাত্রাপথে পরদিন গাছে-গাছে কাদের সাংকেতিক শব্দ-চালাচালি। ওরা আর-এক পাহাড়ে গিয়ে চরতে-বেরুনো একদল সিংহের গুহায় ঢুকে পড়ে। সেখানে অনুসরণকারী তিন আততায়ী ঋজুদার পিস্তলের গুলিতে প্রাণ হারায়। ঋজুদার নির্দেশে তাদের মৃতদেহগুলো তাদেরই জিপে করে দূরে কোথাও রেখে আসবার সময় রুদ্র জিপের গায়ে লেখে, চোরা-শিকারিরা সাবধান। লিখেই ঊর্ধ্বশ্বাস দৌড়। সন্ধের আগে গুহায় ফিরতে হবে। তারপর.....

॥ ২০ ॥

এই গুহার ক্যাম্পে দুদিন হল। দু' রাতও। আজ তৃতীয় রাত। আমরা তিনজনেই রোজ সকালে উঠে তিন দিকে চলে যাই, আগ্নেয়াস্ত্রে পুরোপুরি সজ্জিত হয়ে। জলের বোতল এবং কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে। গলায় বাইনাকুলার ঝুলিয়ে। সারা দিন স্কাউটিং করে বিকেলের আগেই ফিরে আসি। তিনজনের নোটস মিলিয়ে দেখি সন্ধেবেলায়। ঋজুদা বলেছে যে, কাল সকালে একটা জিপ নিয়ে একা চলে যাবে। আমি আর তিতির থাকব এই গুহার ক্যাম্পে। তিতির এবং ঋজুদা দুজনেই এ দুদিনে লক্ষ করেছে যে, সার-সার কুলিরা মাথায় এবং কাঁধে বোঝা নিয়ে কিমিবোওয়াটিঙ্গে পাহাড়-শ্রেণীর দিকে চলেছে। তিতির আগুনের ধোঁয়াও দেখেছে আরও উত্তরে। ওখানে নিশ্চয়ই পোচারদের ক্যাম্প আছে।

এই দুদিনেও যখন কেউই আমাদের গুহার দিকে আসেনি, ওদের দলের তিনজন লোকের গুলিতে মৃত্যুর পরও, তখন ঋজুদার অনুমান এইই যে, চোরা-শিকারিরা আমরা যে এখানে আছি, সে-খবর পায়নি। এবং খুব সম্ভব পাবেও না।

ঋজুদা চলে গেলে, আমাকে আর তিতিরকে সবসময়ই একসঙ্গে ঘোরাফেরা করতে হবে। ঋজুদার অর্ডার।

কালকে বিকেলে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। আমরা যখন তিনজনে তিন দিক থেকে ফিরে আসছি তখন আমরা তিনজনই আমাদের ফেরার পথে নানা রকম জিনিস কুড়িয়ে পাই। সবগুলি জিনিসই বোধহয় একজন লোকেরই ব্যবহারের জিনিস। ব্যাপারটা রহস্যময়। দামি একটা রুপোর কাস্ক পায় তিতির। তার উপরে এনগ্রেভ করা ছিল মালিকের নামের ইনিশিয়ালস। ইংরেজিতে লেখা ছিল, এস ডি। আমি পাই একটি ছুরি। আমেরিকান। রেমিংটন কোম্পানির। ফার্স্টক্লাস ছুরি। পাওয়ামাত্রই কোমরের বেল্টে ঝুলিয়েছি। তার হাতির দাঁতের বাঁটেও লেখা ছিল এস ডি। আর ঋজুদা পেয়েছে প্যারিসের ক্রিশ্চিয়ান ডায়রের দুর্মূল্য সুগন্ধ-মাখা একটি সাদা কিন্তু ভীষণ নোংরা রুমাল। তারও এক কোনায় হালকা নীল সুতোয় লেখা ছিল এস ডি। রুপোর কাস্ক-এ কী একটা তরল পদার্থ

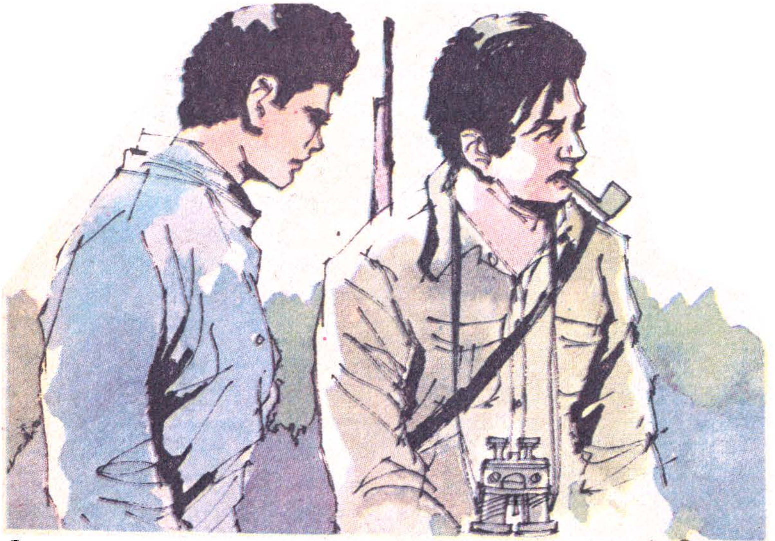

ছিল। ঋজুদা গন্ধ শুঁকে তারপর একটু ঢেলে ফেলে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল আমাদের দিকে। আমরাও সেই লাল পানীয়র দিকে বোকার মতো তাকালে ঋজুদা নিজের মনেই বলেছিল, "আশ্চর্য !"

"কেন ? আশ্চর্য কেন ?" আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম।

ঋজুদা বলেছিল, "লণ্ডনের বেইজওয়াটার স্ট্রিটে একটি ছোট্ট অস্ট্রিয়ান রেস্তোরাঁতে খেতে গেছিলাম। আমার এক নৃতত্ত্ববিদ বন্ধুর সঙ্গে। সেখানে আলাপ হয়েছিল অন্য একজন নৃতত্ত্ববিদের সঙ্গে। তাঁর নাম আজ আর মনে নেই। তবে এটুকু মনে আছে যে, তিনি পুব-আফ্রিকার রিফট্-ভ্যালিতে ডঃ লিকি এবং মিসেস লিকির নেতৃত্বে কিছু কাজ করেছিলেন। কত লোকের সঙ্গেই তো আলাপ হয় ! কিন্তু মনে থাকার মতো তো সকলে নন। ভদ্রলোকের তরুণ বয়স, সুন্দর চেহারা এবং একটা অস্বাভাবিক অভ্যেসের কারণে ওঁকে মনে আছে এখনও। উনি কখনও জল খেতেন না। সেটা আশ্চর্যের কিছু নয়। অনেক ইউরোপিয়ানই জল খান না। কিন্তু উনি স্প্যানিশ ওয়াইন এবং তাও একটিমাত্র বিশেষ ব্র্যাণ্ডের ওয়াইন খেতেন সব সময়। আমার বন্ধুই বলেছিলেন, অন্য কোনোরকম পানীয় তিনি ছুঁতেনই না। সেই পানীয়র নাম "বুল্‌স্ ব্লাড"। সে রাতে ওঁর অনুরোধে আমিও খেয়েছিলাম। ভাল, তবে দারুণ কিছু একটা নয়।"

"কী বললে ? ষাঁড়ের রক্ত ? বুল্‌স্ ব্লাড !" তিতির বলেছিল।

"হ্যাঁ। এই অদ্ভুত নামের জন্যই পানীয়র কথাটা মনে আছে এতদিনের ব্যবধানেও। আমার বন্ধু ওঁকে ঠাট্টা করে বলেছিলেন, তুমি তো একাই একটা ওয়াইন কোম্পানিকে বড়লোক করে দিলে হে।"

"তোমার সঙ্গে কি তাঁর পুব-আফ্রিকার চোরা-শিকারি বা অন্য কোনো ব্যাপারে আলোচনা হয়েছিল ?" আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম ঋজুদাকে।

"মনে করতে পারছি না। বোধহয়

হয়েছিল। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। আমি ওঁকে বলেছিলাম যে, লেক্ লাগাজার কাছে আমি সিলিকার মতো কিছু দেখেছিলাম এবং গোরোংগোরো ক্র্যাটারের একটি জায়গার মাটি দেখে আমার মনে হয়েছিল যে, ওখানে হেমাটাইট বা ডোলোমাইট থাকলেও থাকতে পারে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। পরিষ্কার মনে পড়ছে—বলেছিলাম।"

"বললে কেন? উনি তো ভূতত্ত্ববিদ নন। নৃতত্ত্ববিদ।"

"বলেছিলাম এমনিই গল্পে গল্পে। এও বলেছিলাম যে, কৃষ্ণ মহাদেশ আফ্রিকার জায়েরেই খনিজ পদার্থ বেশি পাওয়া যায় বলে জানে লোকে। আসলে আফ্রিকা এত বড় দেশ এবং এত কিছু লুকিয়ে আছে এর অনাবিষ্কৃত বিস্মৃত বুকের ভিতরে যে, একদিন আফ্রিকা পৃথিবীর সব চাইতে বেশি শক্তিশালী দেশ হয়ে উঠবে। যদি তার আগেই পারমাণবিক বোমাতে পৃথিবী ধ্বংস না হয়ে যায়।

"বলেছিলাম বটে। কিন্তু এ-সব ব্যাপারে মানুষটির কোনো ইনটারেস্ট ছিল বলে মনে হয়নি।"

আমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। কাল আমি ছোট্ট একটি বুশবাক্ মেরেছিলাম। ঋজুদার পিস্তল দিয়ে। যতদিন সম্ভব আওয়াজ না করে পারা যায়। সেটাকে স্মোক করে নিয়েছি শুকনো খড়-কুটো আর ক্যাকটাই পুড়িয়ে। এখন প্রচণ্ড শীতও। পলিথিনের ব্যাগে মুড়ে রেখে দিয়েছি। আমাদের কুক তিতির সুন্দর করে কেটে রোস্ট করে দেয়। স্যাণ্ডউইচও করে। কিন্তু নিজে খায় না। বলে, বোঁটকা গন্ধ।

গুহার মুখে পাথরের আড়ালে বসে ছিলাম। যাতে আমার শিল্যুট দেখা না যায়। টুপি ও জার্কিন চাপিয়ে পাশে লোডেড রাইফেল রেখে। প্রথম রাতটা আমার পাহারার পালা। শেষ রাতে

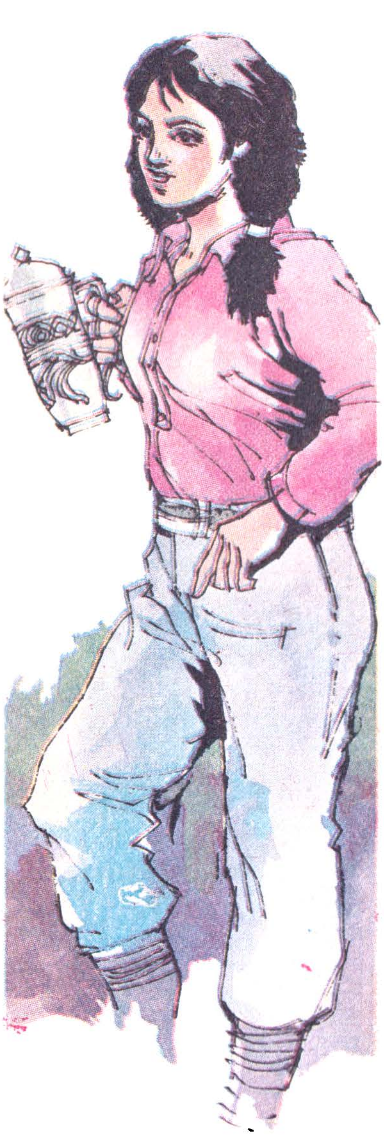

সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্ক দিচ্ছে সুখের পথনির্দেশ

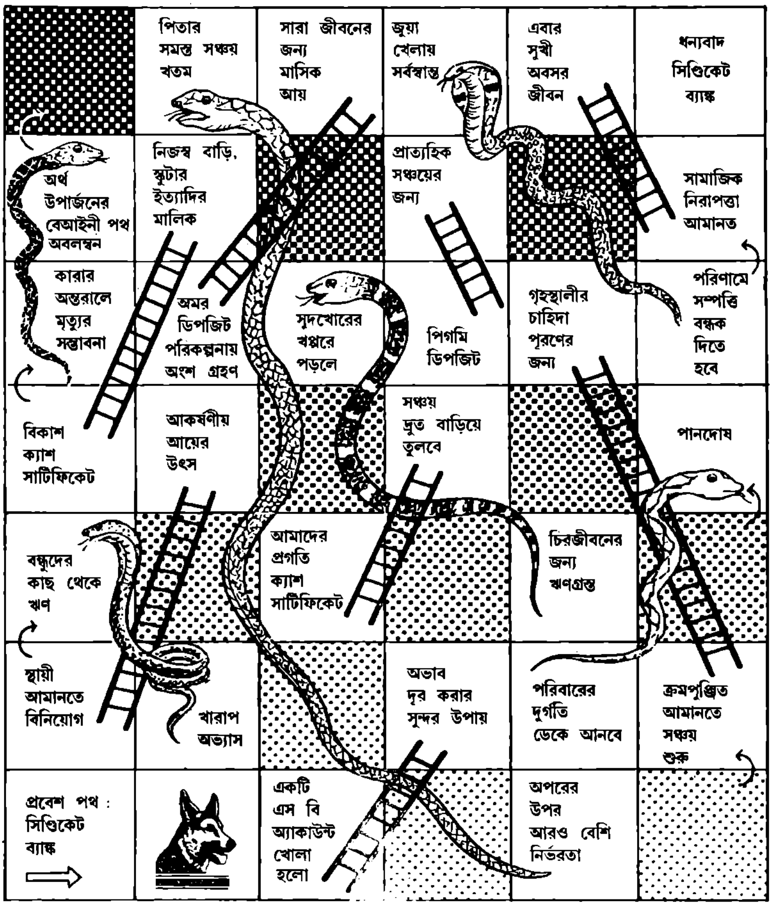

maa (S) SB 8270

ঋজুদা। তিতিরকে আপাতত রেহাই দেওয়া হচ্ছে।

অন্ধকারের মধ্যে আদিগন্ত আকাশে তারারা চাঁদোয়া ধরেছে মাথার উপর। হাতির দল চলা শুরু করেছে। খুব আওয়াজ করে হাতিরা। যখন দলে থাকে। শুঁড় দিয়ে ডালপালা ভেঙে যাওয়ার আওয়াজ তো আছেই। পেটের ভিতরেও নানা রকম আওয়াজ হয়। অত বড় বড় পেট তো! যজ্ঞিবাড়ির উনুনের মতোই, তাতে সবসময়ই হজমের প্রক্রিয়া চলছে। অত বড় ব্যাপার, আওয়াজ তো একটু-আধটু হবেই। খলবল, ছলছল, পকাত—নানারকম মজার মজার আওয়াজ হয় ওদের পেটের মধ্যে।

আমাদের দেশের আকাশের তারাদের কিছু কিছু চিনি। আফ্রিকা তো অনেকই পশ্চিমে। তাই আমাদের দেশের আকাশে বছরের এই সময় যা দৃশ্য, আফ্রিকার আকাশের দৃশ্য তার চেয়ে একটু আলাদা। ঝকঝক করছে সপ্তর্ষিমণ্ডল। কত নাবিক, কত বিজ্ঞানী, কত পর্যটক এই তারামণ্ডলী দেখে পথ চিনে নিয়েছেন সৃষ্টির প্রথম থেকে। দেখতে পাচ্ছি, পুবে মরীচি। পশ্চিমে ক্রতু। মধ্যে পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ। এই সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাত ঋষির সাতজন স্ত্রী। তিতির জানত না। ওকে কাল বলছিলাম সে-কথা। স্ত্রীদের নাম সম্ভূতি, অনসূয়া, ক্ষমা, প্রীতি, সন্নতি, অরুন্ধতী এবং লজ্জা। সাত ঋষির স্ত্রীদের দেখা যায় কৃত্তিকাতে। কিন্তু খালি চোখে এবং সহজে অরুন্ধতীকে দেখা যায় না। কৃত্তিকার মধ্যে অরুন্ধতীই সবচেয়ে বিদুষী এবং খুব বড় তাপসী। অরুন্ধতী কৃত্তিকার মধ্যে না-থেকে রয়েছেন সপ্তর্ষিমণ্ডলেই। তাঁর মহাপণ্ডিত তাপসশ্রেষ্ঠ স্বামী বশিষ্ঠের পাশে। একটি ছোট্ট তারা হয়ে।

ছবি : অনুপ রায়

কেরামতি

কালিদাস ভট্টাচার্য

ঝড়টা যখন রাজার দেশে
ভাঙছে বাড়িঘর
রাজা বললেন, "সৈন্যরা সব,
ঝড়কে তোরা ধর।"
নিজেও তিনি ধরতে গেলেন
তিনবার পর পর,
শূন্য হাওয়ায় ঘুরিয়ে কৃপাণ
বুক করে ধড়ফড়।
একটু পরেই দম ফুরিয়ে
পালিয়ে গেল ঝড়,
প্রজারা কয়, "হে মহারাজ
তোমায় করি গড়।"

ছবি : অনুপ রায়

সোনারপুরের সোনাদানা

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

মুনমুনকে স্কুল থেকে নিয়ে ফেরার সময় বিকেলের দিকে কালীঘাটের কাছাকাছি হাজরা রোডের ওপর ছোট একটা ছবি বাঁধাই করার দোকানের সামনে ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বলল তার মা। সাইনবোর্ডে বেশ বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে, গাবুর ছবি-বাঁধাইয়ের দোকান। রাস্তা থেকেই দেখা যায় দোকামের ভেতর কয়েকটা বাঁধানো ছোট বড় ছবি টাঙানো আছে। একদিকে ঠাকুর রামকৃষ্ণ, সাইবাবা, বিবেকানন্দ, অন্যদিকে কলকাতা আর বম্বের নামকরা কয়েকজন ফিল্মস্টার।

গাড়ি থেকে নেমে মুনমুন আর তার মা ঢুকল গাবুর দোকানে। ড্রাইভার খুব বড় আর ভারী একটা ছবি একদিকে নামিয়ে রেখে আবার গাড়িতে গিয়ে বসল।

গাবু মাদুরের ওপর বসে ছোট হাতুড়ি দিয়ে একটা ছবির ফ্রেমে ঠুকঠুক করে পেরেক মারছিল, হঠাৎ এদের দেখে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হাতুড়ি-টাতুড়ি সরিয়ে রেখে দুটো টুল এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বসুন, বসুন।'

কেউ বসল না। মুনমুনের মা অল্প হেসে বলল, 'এই ছবির কাচ ভেঙে গেছে, ঠিক করে বাঁধিয়ে দিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই দেব।' গাবু বড় আর ভারী ছবিটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে মুগ্ধ চোখে বেশ কিছুক্ষণ দেখল। দেখতে দেখতে বলল, 'কী সুন্দর চেহারা!'

মুনমুনের মা আবার হাসল, 'আমার ঠাকুর্দার ছবি। খুব বড় আর ভারী তো। হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে যায়, তাই কাচ ভেঙে গেছে।'

'ও আমি ঠিক করে দেব, কবে চাই আপনার বলুন?'

'আমার কোনো তাড়া নেই। কবে দিতে পারবেন?'

'এই দিন চার-পাঁচ পর। আজ তো বুধবার, এই ধরুন আগামী সোমবার এই সময়—'

'ঠিক আছে।'

ছবিটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে গাবু বলল, 'তবে একটা কথা বৌদি—'

'কী?'

'ফ্রেমটা বড় পুরনো হয়ে গেছে। এই দেখুন না রঙ-টঙ চটে জায়গায়-জায়গায় ক্ষয়ে গেছে। খোলাখুলি করলে জোড়াতালির দাগ থেকে যেতে পারে। এত দামি ছবি, তাই বলছিলাম একটা নতুন ফ্রেম দিয়ে দি?'

'তাই দিন।'

মুনমুন এত পরে কথা বলল, 'ও মা, সাদা ফ্রেম দিতে বলো।'

'সাদা ফ্রেম ?' গাবু হেসে বলল, 'তাহলে খরচ একটু বেশি পড়বে যে বৌদি—'

'তা পড়ুক—' মুনমুনের মা জিজ্ঞেস করল, 'কত পড়বে ?'

গাবু মনে মনে হিসেব-টিসেব করে বলল, 'এই ধরুন, তা প্রায় ষাট টাকা মতো।'

'ঠিক আছে। আমরা তাহলে সোমবার আসব।'

গাবু কথা বলল না, মাথা নেড়ে হাসল। মুনমুন আর তার মা গাবুর দোকান থেকে বেরিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল। গাবু মুখ তুলে ওদের গাড়িটা দেখল। দেখে ভাবল, বেশ পয়সাওলা খদ্দের—বাঁধাই-খরচা আর একটু বেশি বললেও ওরা কোনো আপত্তি করত বলে মনে হয় না।

বর্ষাকাল। বিকেলের রোদ ঝুপ করে পড়ে গেল। চারপাশ ঝাপসা হয়ে এল। হাওয়া সিরসির করে উঠল। আর একটু পরেই হয়তো টিপটিপ বৃষ্টি শুরু হবে। গাবু টুল দুটো টেনে-টেনে ঠিক জায়গায় রাখল। আর হাতের কাছে যে ছবি ছিল তা সরিয়ে রাখল। রেখে মুনমুনের মার ঠাকুর্দার ছবিটা মাদুরের ওপর ফেলে প্রথমে ফ্রেম খোলার যন্ত্রপাতি টেনে নিল। কথা ঠিক রাখতে হবে। আজ থেকেই সে কাজ শুরু করে দেবে।

ফ্রেমটা খুলে ফেলতে বেশি সময় লাগল না গাবুর। অনেক-অনেক দিন আগে বাঁধাই করা হয়েছিল ছবিটা। পিচবোর্ড একেবারে স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে। সেটা তুলে নিল গাবু। সে দেখল, নীল ফুলস্ক্যাপ সাইজের একটা কাগজ আলগা করে সাঁটা আছে সেই পিচবোর্ডে। জায়গায় জায়গায় কালো দাগ হয়ে গেছে কাগজে, কোথাও-কোথাও ছেঁড়া। আর ঠিক মাঝখানে খুব বড় বড় অক্ষরে ছড়ার মতো কী যেন লেখা আছে। গাবু প্রথমে গ্রাহ্য করল না। ভাবল, হয়তো এই ভদ্রলোকের নামধাম আর বংশ-পরিচয় লেখা আছে—যেমন থাকে অন্য অনেক ছবিতে। কিন্তু ছড়াটা পড়তে পড়তে গাবুর বুক উত্তেজনায় থরথর করে উঠল। তার শরীরে রোমাঞ্চ হল। সে সোজা হয়ে বসল। ছড়াটা একবার পড়ল, দুবার পড়ল—পড়ে পড়ে তার মুখস্থ হয়ে গেল—

> পাপের ধন পুঁতে দিলাম মাটিতে
> কুয়োর দক্ষিণে বিশ পা হবে হাঁটিতে
> ধনরত্ন চাও যদি খোঁড়ো তবে মাটি
> পেয়ে যাবে পাপের ধন সোনাদানা
> খাঁটি !!

ব্যস্, গাবুর কাজকর্ম মাথায় উঠল। ছড়ার কয়েকটা লাইন তাকে অদ্ভুত একটা নেশায় মাতিয়ে তুলেছে। গাবু বুঝল যে এখন তার পক্ষে আর দোকানে বসে থাকা সম্ভব নয়। ছবি-টবি সরিয়ে রেখে সে উঠে দাঁড়াল। সেই কাগজটা সাবধানে ভাঁজ করে পকেটে রাখল। তারপর দোকানের দরজা বন্ধ করে দুটো বড় বড় তালা লাগিয়ে রাস্তায় নামল গাবু।

ঝিরঝির বৃষ্টি শুরু হয়েছে। লোক ছুটছে এদিক-ওদিক। গাড়ির হর্ন, ট্রামের ঘণ্টা বেজেই চলেছে। কিন্তু গাবু বড় রাস্তার দিকে গেল না, এ-গলি ছাড়িয়ে, ও-গলি পার হয়ে খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে সে ভাঙাচোরা প্রায় হেলেপড়া খুব পুরনো একটা বাড়ির সামনে এল। তারপর মুদি আর কয়লা-কেরোসিনের দোকানের পাশ দিয়ে বাড়ির একেবারে পিছনের দিকে এসে দরজার কড়া নাড়ল বেশ জোরে।

প্রথমে কেউ সাড়া দিল না। গাবু আর একটু জোরে কড়া নাড়তে নাড়তে ডাকল, 'মামা, ও মামা !'

এবার ভেতর থেকে ভারী গলায় একজন বলে উঠল, 'গাবু নাকি ?'

'হ্যাঁ মামা।'

গাবুর মামা তখন চিৎকার করে তার কালা চাকরকে বলল, 'ওরে ভম্বু, দরজা খোল রে বেটা।'

গাবু ভেতরে এল। অন্ধকার ঘুপচি ঘর। ঘরে অনেক পেরেক মারা। পেরেকে নানারকম পোশাক ঝুলছে। কোনোটা রেলের

টিকেট কালেক্টরের, কোনোটা সন্ন্যাসী কিম্বা ফকিরের। দু-একটা স্যুট আর পুলিশের মতো ইউনিফর্মও আছে। গাবুও এ-ঘরে থাকে।

তার মামা গদা শুয়ে-শুয়ে বিশ্রাম করছিল, গাবুকে দেখে উঠে বসল, 'কী খবর রে ? লুঠের টাকার ভাগ কেউ দিয়ে গেছে ?'

'না, কেউ আসেনি।'

'ইডিয়ট কোথাকার !' গদা গর্জন করে উঠল, 'তবে তুই চলে এলি যে ? শিলিগুড়ি থেকে মালপাচারের খবরের জন্যে হাঁ করে বসে আছি, তাছাড়া খিদিরপুর থেকে লোক আসবে—'

গদার বকুনি খেয়ে গাবু দমে গেল না, পকেট থেকে সেই কাগজটা বের করে ভাঁজ খুলতে খুলতে বলল, 'তোমাকে একটা জোর খবর দিতে এলাম মামা, গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি—' বলে সে সেই ছড়াটা আর একবার পড়ল।

গদা গাবুর হাত থেকে কাগজটা টেনে নিয়ে নিজেও ছড়াটা জোরে-জোরে পড়ল। পড়ে কাগজটা উল্টেপাল্টে দেখে হাসল, 'যত্ত গুলতালের ব্যাপার, কোথায় কুড়িয়ে পেলি এটা ?'

'কুড়িয়ে পাইনি মামা—' গাবু গদাকে তখন মুনমুনের মার কথা, ছবির কথা—সব বলল।

'হুঁ, তা কোথায় থাকে তারা ?'

'তা তো জানি না।'

'তবে ?' গদা গাবুকে বলল, 'গাধা কোথাকার ! এ কাগজটা এবার তোর একটা ছবির সঙ্গে বাঁধিয়ে গলায় ঝুলিয়ে ঘুরে বেড়া। আমার কিচ্ছু করবার নেই।'

গাবু তার মুখের অপ্রস্তুত ভাব তাড়াতাড়ি কাটিয়ে নিয়ে বলল, 'নাম ঠিকানা—সব জেনে নেব মামা। সোমবার বিকেলে উনি আবার আসবেন ছবিটা নিতে।'

গদা ছড়ার কাগজটা পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'সোমবার বিকেলে ?' সে হাসল, 'দেখ্ এই দুর্ভিক্ষের বাজারে যদি গুপ্তধনের সন্ধান আনতে পারিস ! লুঠ, চোরাকারবার, ছেনতাই-টেনতাই-এর রিস্ক অনেক। পুলিশের গুলি খেয়ে মারা পড়ার চান্স। তোর দৌলতে যদি রাজা-গজা হতে পারি—' হো হো করে হেসে উঠল গদা, 'যা বেটা এবার দোকানে ফিরে, কখন কী খবর আসে বলা যায় না।'

গাবু উঠে দাঁড়িয়েছিল, এমন সময় ভস্মু এসে বলল, 'চা করি বাবু ?'

'হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি করবি ! বোস গাবু। ভিজেছিস দেখছি, এক কাপ গরম চা খেয়ে যা।'

ভস্মু হাত কচলে বলল, 'চিনি ফুরিয়ে গেছে যে, যাটটা পয়সা দিন, নিয়ে আসি।'

ভস্মু বেরিয়ে যাবার পর আবার শুয়ে পড়ল গদা। গাবু জানে মামার যখন রাতে কাজ থাকে তখন দিনেরবেলা সে যতক্ষণ পারে ঘুমিয়ে নেয়। গদা গাবুর দূরসম্পর্কের মামা হলেও সে তাকে গুরুর মতো মনে করে। এই মামা তাকে আশ্রয় দিয়ে শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ না করিয়ে নিলে আজ হয়তো গাবুকে রাস্তায়-রাস্তায় ভিক্ষে করে দিন কাটাতে হত।

গাবুর মামা গদা একজন সাংঘাতিক লোক। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে সে গাড়ি চুরি করে। সেই গাড়িতে নেপাল থেকে গাঁজা নিয়ে এসে বিক্রি করে এখানে। দেশ-দেশান্তর থেকে গদা এইরকম আরও অনেক জিনিস প্রায়ই আনায়। কখনো রেলের কর্মচারী সেজে সে যাত্রীদের ঠকিয়ে টাকা আদায় করে। পুলিশ সেজে নিরীহ লোকের কাছ থেকে ঘুষ খায়। সাহেবের বেশে একটা ভুল ঠিকানা দিয়ে অনেককে চাকরির লোভ দেখিয়ে টাকা নেয়। তাছাড়া, ব্যাঙ্কলুঠ, ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ছোরা দেখিয়ে টাকা-পয়সা নিয়ে নেওয়া—এসব তো তার কাছে জলভাত। একটা মস্ত সুবিধাও আছে গদার। বড় সুন্দর চেহারা তার। রাজা-রাজড়ার মতো । হয়তো সেই কারণেই পুলিশ তাকে হঠাৎ সন্দেহ করতে পারে না।

গাবুর ছবি-বাঁধাইয়ের দোকানটা আসলে গদার ছোটখাটো গোপন অফিস। গদাকে খুব

সাবধানে বসবাস করতে হয়, অন্ধকার ঘুপচি ঘরে সে বেশির ভাগ সময় লুকিয়ে থাকে প্যাঁচার মতো। গাবু তার বিশ্বস্ত অনুচর। যত খবর তার দোকানেই আসে প্রথম। কেউ কালী কিম্বা অন্য কোনো দেবদেবীর ছবি বাঁধাই করার ছলে এসে ঢোকে গাবুর দোকানে, তারপর তাকে যা বলবার বলে যায়—গাঁজার গাড়ি পুলিশ আটকেছে, কিম্বা ট্যাক্সির ছেনতাই-এর টাকা নিয়ে মুন্দ ফেরার হয়েছে কিম্বা কাল দুপুর বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে কার্লবাটসন কোম্পানির সরকার নিউ আলিপুরের নিউল্যাণ্ড ব্যাঙ্কে তিরিশ হাজার টাকা তুলতে আসবে—এইরকম সব সুখদুঃখের খবর গাবু ঠিক সময় তুলে দেয় গদার কানে। তারপর যা করবার করে গদা।

বর্ষার জন্যে একটু তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে এসেছে। ঝিরঝির বৃষ্টি থেমে গেছে এখন। গাবু ইচ্ছে করেই আলো জ্বালল না, কেননা তার মনে হল মামা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। বসে-বসে ধৈর্য হারাল গাবু। চিনি কিনে ভম্বু এখনো ফিরল না। লোকটা গেল কোথায়? গাবুর এখন দোকানে ফিরে না গেলেই নয়।

গাবু যখন এই রকম ভাবছে, ঠিক তখন চোখ পিটপিট করে গদা জিজ্ঞেস করল, 'কালাটা ফেরেনি?'

'না, মামা। কিন্তু গেল কোথায়?'

'হর্ন-টর্ন শুনতে না পেয়ে গাড়ির তলায় গিয়ে পড়েছে হয়তো—এতক্ষণে যমের বাড়ি!'

'আমি তবে যাই মামা?'

'যা-যা শিগগির। দোকানে বসে চা আনিয়ে খাস। পয়সাকড়ি আছে তো সঙ্গে?'

'তা আছে।'

গাবু রাস্তায় নামল। থেকে-থেকে মেঘ ডাকছে। রাস্তা ভিজে-ভিজে। চারপাশ অন্ধকার। এখনো একটাও আলো জ্বলেনি। লোডশেডিং কি-না কে জানে। কিন্তু আজ এই পিছল রাস্তায় ভিজে অন্ধকারে গলিঘুচি

ধরে হাঁটতে খুব ভাল লাগছিল গাবুর। তার মনে একটা সহজ বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, সে অনেক ধনরত্ন পাবেই। ছড়াটা আর একবার মনে মনে আউড়ে নিল গাবু। কিন্তু পাপের ধন কেন? কে পাপ করল আর কে ধনরত্ন পুঁতে রাখল মাটিতে? গাবুকে সব জেনে নিতে হবে কৌশলে। তারপর যত দূরেই যেতে হোক, গাবু যাবে তার মামার সঙ্গে । গিয়ে মাটি খুঁড়বে কুয়োর দক্ষিণে বিশ পা হেঁটে গিয়ে। খুঁড়বে, খুঁড়বে, খুঁড়বে। তারপর? গাবুর শরীর থরথর করে কাঁপতে থাকে উত্তেজনায়। সে এসে দাঁড়ায় তার দোকানের সামনে।

চাবি ঘুরিয়ে দু-দুটো তালা খুলল গাবু। আলো জ্বালল। না, এদিকে লোডশেডিং নেই। হঠাৎ গাবুর চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। মাথাটা ঘুরে উঠল তার। সে এদিক দেখল, ওদিকে দেখল। মাদুর তুলে ফেলল। যত ছবি ছিল দুমদাম ঠেলাঠেলি করে সব তছনছ করে ফেলল। না, নেই। ঝুনঝুনের মার ঠাকুর্দার সেই বড় ছবিটা কোথাও নেই। কে নিল ওটা? দোকানের তালা লাগানো ছিল যেমনকার তেমন। কেউ তা ভাঙেনি। তবে? গাবু মাথায় হাত দিয়ে এলোমেলো মাদুরের ওপর বসে পড়ল।

॥ ২ ॥

আজ আকাশ একেবারে পরিষ্কার। গ্রীষ্মকালের মতো কড়া রোদ এসে পড়েছে গাবুর দোকানের ওপর। গাবুর মন আজ খুব খারাপ। ছবি চুরি যাওয়ার কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। যদিও গদা খবরটা শুনে খুব খুশি। জোরে হেসে গাবুর পিঠ চাপড়ে বলেছে, 'দারুণ খবর পেয়েছিস। তাহলে সত্যি মাটির তলায় কারেন্সি-বাড়ি আছে। হ্যাঁ রে গাবু, দেখেছিস ছবিটার এপাশে-ওপাশে আর কিছু লেখা-টেখা ছিল কি না?'

'না।'

'তুই সেই মহিলার নাম-ধাম ঘাটির খবর যোগাড় কর। দেখি কী করতে পারি।

রাইভেল আছে মনে হচ্ছে, খেল্ দারুণ জমবে।'

'কিন্তু ছবি যখন উনি নিতে আসবেন, খোয়া যাবার কথা বলব কেমন করে ?'

'দূর বুদ্ধু! আসল কথা ভাঙবি কেন—বলবি, ছবি কারখানায় ভাল করে বাঁধাই হচ্ছে।'

হ্যাঁ, সেইরকম একটা কিছু বলবে গাবু। বলে দরকারি সব তথ্য যোগাড় করবে। আজ সোমবার। আর একটু পরেই তার দোকানের সামনে সেই ঝকঝকে নতুন গাড়িটা এসে দাঁড়াবে। গাবু রাস্তার দিকে তাকিয়ে হাসি-হাসি মুখ করবার চেষ্টা করে চুপচাপ বসে থাকল।

একটা অবাঙালি ফলওলা এসে বসেছে গাবুর দোকানের লাগালাগি ফুটপাথে। থেকে-থেকে সে চিৎকার করে উঠছে, কেলা, পেয়ারা! কেলা, পেয়ারা! আর কখনো মুগ্ধ চোখে হাঁ করে গাবুর দোকানে টাঙানো বাংলা আর বম্বের ফিল্মস্টারের ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকছে।

মুনমুন আর তার মা অল্প পরেই এল গাবুর দোকানে। গাবু এর আগের দিনের মতো টুল এগিয়ে দিয়ে তাদের বেশ খাতির করে বসতে বলল।

আজ কিন্তু ওরা দুজনেই বসল। ওদের দেখে চুপড়ি ঠেলে সেই ফলওলা গাবুর দোকানের দিকে আরও সরে এল। এসে মুনমুনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পেয়ারা দেব দিদি ? কাশীর পেয়ারা ?'

মুনমুন মিষ্টি হেসে বলল, 'পরে।' আসলে সে নুন দিয়ে পেয়ারা খেতে ভীষণ ভালবাসে।

মুনমুনের মা এদিক-ওদিক তাকিয়ে তার ঠাকুর্দার ছবিটা দেখতে না পেয়ে গাবুকে বলল, 'ছবিটা হয়নি ?'

'হচ্ছে বৌদি, কারখানায় পাঠিয়েছি—' গাবু হাসল, 'সাদা ফ্রেমের কাঠ পেতে দু-একদিন দেরি হল কিনা।'

'কবে পাওয়া যাবে ?'

'এই দু-চারদিনের মধ্যেই—' গাবু বলল, 'আপনাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না, আমিই বাড়িতে দিয়ে আসব। ঠিকানাটা বলুন বৌদি।'

'দুশো তেরো লেকভিউ রোড, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে—' মুনমুনের বাবার নামও বলল তার মা, 'স্বরাজ চ্যাটার্জি।'

গাবু ছোট একটা খাতায় সব লিখে নিয়ে বলল, 'কী সুন্দর চেহারা আপনার ঠাকুর্দার! উনি কোথাকার রাজা ছিলেন বৌদি ?'

'না না, রাজা-টাজা কিছু নয়—' মুনমুনের মা হেসে বলল, 'উনি জমিদার ছিলেন।'

'ওই একই হল। বড় জমিদার তো রাজাই। তা জমিদারি কোথায় ছিল আপনাদের ?'

'এই তো কাছেই, সোনারপুরে—' বাপের বাড়ির কথা শোনার একজন নতুন শ্রোতা পেয়ে মুনমুনের মা বেশ উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'জমিদারি-টারি এখন আর নেই, শুধু পৈতৃক বাড়িটা আছে।'

মুনমুনের মা লক্ষ করল না, বাড়ির কথা শুনে গাবুর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। সে বলল, 'আপনার মা-বাবা থাকেন সে-বাড়িতে ?'

'না, মা-বাবা বেঁচে নেই। আমার দিকে কেউই আর নেই। বাড়িটা আমার একার।'

'তা আপনারা সে-বাড়িতে থাকলেই তো পারেন ?'

'না—' মুনমুনের মা করুণ করে হাসল, 'তা আর হয় না।'

'কেন, কেন ?'

'সে অনেক ব্যাপার।'

গাবু উৎসাহ প্রকাশ করে বলল, 'কী ব্যাপার ? একটু বলুন না শুনি ? আমরা গরিব মানুষ, জমিদারবাড়ির কথা শোনার সৌভাগ্য তো আর হয় না!'

মুনমুনের মা কয়েক মুহূর্ত কী ভাবল, বাইরে তাকিয়ে রাস্তা দেখল। ফলওলাকে দেখল। ফলওলা এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তার দিকে। চোখে চোখ পড়তেই সে

চিৎকার করে হেঁকে উঠল, 'কেলা, পেয়ারা ! কেলা, পেয়ারা ! কাশীর পেয়ারা জোড়া চালিশ !'

গাবু তাকে ধমক দিল, 'এই, আস্তে । বলুন বৌদি ?'

মুনমুনের মা যেন একটা আবেশের ঘোরে তার বংশের গোটা ইতিহাস শুনিয়ে দিল গাবুকে । তার ঠাকুর্দা শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদারি ভোগ করতে চাননি । বিষয়সম্পত্তি রক্ষা করার কোনো আগ্রহ তাঁর ছিল না । ফলে জমিদারির অনেকটাই নায়েব-গোমস্তার ষড়যন্ত্রে নষ্ট হয়ে যায় । সোনারপুরের জমিদারি সম্পর্কে ঠাকুর্দার এইরকম উদাসীন হয়ে ওঠার একটা কারণ ছিল । তাঁর পূর্বপুরুষ ছিল অত্যন্ত অত্যাচারী জমিদার । মানুষ যে এত নিষ্ঠুর হতে পারে তা ভাবা যায় না । নিজেদের খেয়ালখুশি চরিতার্থ করার জন্যে গরিব প্রজাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার করে তারা খাজনা আদায় করত ।

সোনারপুরের বাড়িতে গভীর রাতে শ্রীনাথ ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেছেন । বেশ ভাল করে দেওয়া থাকলেও এক-এক রাতে খুট করে তাঁর শোবার ঘরের খিল খুলে যেত । ঠাকুর্দা চিৎকার করে উঠতেন, কে ? কে ?

কোনো সাড়া নেই । শুধু অদ্ভুত আলোর রেখা কাঁপত দরজার কাছে । সেই আবছা আলোয় ঠাকুর্দা দেখতেন খুব রোগা একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে । তার একটা হাত কাটা কিন্তু হিংস্র চোখ দুটো জ্বলছে বাঘের মতো ।

কে তুমি, কী চাও ? ঠাকুর্দা উঠে বসতেন খাটের ওপর ।

লোকটা কথা বলত না । অন্য হাত দিয়ে তার কাটা হাতটা দেখাত আর এক পা-এক পা করে এগিয়ে আসত ঠাকুর্দার গলা টিপে ধরবার জন্যে । তিনি খাট থেকে নেমে সমস্ত শক্তি দিয়ে বাধা দিতে যেতেন, কিন্তু কেউ নেই । অন্ধকার । হাতকাটা লোকটা পলকে কোথায় মিলিয়ে গেছে । ঠাকুর্দা হুমড়ি খেয়ে পড়তেন মেঝের ওপর ।

আর এক রাতে কান্নার করুণ আওয়াজে ঠাকুর্দার ঘুম ভেঙে যায় । মশারির ভেতর থেকে তিনি দেখলেন একটি অল্পবয়েসি বউ ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে । তার কোলে ঘুমিয়ে আছে কচি একটা বাচ্চা । ঠাকুর্দার চোখে চোখ পড়তে কান্না থেমে গেল বউটির । সে তাকিয়ে থাকল ঠাকুর্দার দিকে । তখন আগুন ঠিকরে পড়ছে তার চোখ থেকে । ঠাকুর্দা নড়াচড়া করতে পারলেন না, পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকলেন মশারির ভেতর ।

এইরকম কত যে অদ্ভুত-অদ্ভুত দৃশ্য তিনি দেখেছেন তার ঠিক নেই । ওই সোনারপুরের বাড়িতেই ভয় পেয়ে খুব অল্প বয়েসে মারা যান আমার ঠাকুরমা । নীচে সকলের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে রাত এগারোটা নাগাদ দোতলার লম্বা অন্ধকার বারান্দা ধরে শোবার ঘরের দিকে তিনি আস্তে আস্তে হেঁটে আসছিলেন, হঠাৎ কিছু দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠেন । পরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান মাটিতে । তাঁর জ্ঞান আর ফিরে আসেনি । আমার যখন পাঁচ-ছ বছর বয়েস তখন আমার মা-ও মারা যান ঠিক এইভাবে ।

এই সব কারণে ঠাকুর্দার মনে সুখ ছিল না । তাঁর ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে পূর্ব-পুরুষের সম্পত্তি হল পাপের ধন । যে ভোগ করবে তার বংশ হবে অভিশপ্ত । তিনি খুব সাধারণভাবে দিন কাটাতেন । তাঁর পূর্বপুরুষের যত ধনরত্ন ছিল বাড়িতে সব তিনি বোধহয় বিদ্যাধরী নদীতে ফেলে দিয়েছিলেন বংশ ছারখার হয়ে যাবে মনে করে ।

মুনমুন এ-সব কথা তার মার মুখে আগে অনেকবার শুনলেও আজও খুব মন দিয়ে যেন নতুন করে শুনছিল । আসলে সোনারপুরের প্রাসাদের মতো বাড়িটা তার বড় প্রিয় । ইংরেজি ডিটেকটিভ বইতে ব্যারন কিম্বা লর্ডদের বড় বড় বাড়ির যেমন বর্ণনা থাকে, মুনমুনের মনে হয় এ বাড়িটা ঠিক যেন তেমন । তার এক-একবার ভীষণ ইচ্ছে করে সোনারপুরে গিয়ে থাকতে । ছুটি-টুটি হলে

বাবাও যেতে চায়। কিন্তু মুনমুনের মা দু-একদিনের বেশি কিছুতেই থাকতে চায় না, রাতে খুব ভয়ে-ভয়ে থাকে, ভাল করে তার ঘুম হয় না।

জীবন ওখানকারই লোক। তাকে রাখা হয়েছে সোনারপুরের বাড়ি দেখাশোনা করবার জন্যে। কিন্তু সে-ও রাতে সেখানে থাকতে সাহস পায় না, সন্ধের মুখে-মুখে চলে যায়।

মুনমুনের মা গাবুকে আরও অনেক কথা বলল। শ্রীনাথ মারা যাবার পর-পরই মুনমুনের দাদু সোনারপুরের বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন। এখানেই তিনি ওকালতি করতেন। মুনমুনের মা-র বিয়ের বছরখানেক পরে তিনিও মারা যান।

এত সব বলে মুনমুনের মা উঠে দাঁড়াল, 'বাপের বাড়ির দিকের আমার কেউই আর নেই, শুধু সোনারপুরের ওই বাড়িটা আছে।'

সব শুনে মনে মনে গাবু খুশিতে ফুলে উঠছিল। সে ভাবতে পারেনি যে এত সহজে কাজ হাঁসিল করতে পারবে। সে যতটুকু জানতে চেয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশি জেনে ফেলেছে। গদামামাকে সব বলবার জন্যে সে বড় অস্থির হয়ে পড়ছিল।

উত্তেজনা যথাসম্ভব দমন করে মুনমুনের মা-কে গাবু বলল, 'বৌদি, আপনারা কত বড়লোক! আমার ভাগ্য যে এই দোকানে আপনার পায়ের ধুলো পড়েছে। দরকারমতো বাড়ির সব ছবি আমাকে দিয়ে কিন্তু বাঁধাবেন বৌদি।'

'হ্যাঁ, বাঁধাব।'

মুনমুন মার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে কী বলল। তার মা হাসল, 'পেয়ারা কিনবি? বল-না ফলওলাকে—'

কিন্তু কোথায় সেই ফলওলা? কখন সে গাবুর দোকানের লাগালাগি ফুটপাথ থেকে সরে গেছে কেউ লক্ষ করেনি।

মুনমুন আর তার মা হাজরা থেকে ল্যান্সডাউন রোড ধরে খুব অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে গেল লেক ভিউ রোডে। লেকের কাছাকাছি তাদের ছিমছাম দোতলা বাড়ি। মুনমুনের বাবা আজ বেরোয়নি। অফিসের কী একটা জরুরি কাজে আজই তাকে চার-পাঁচদিনের জন্যে দিল্লি যেতে হবে।

দোতলায় উঠে শোবার ঘরের দিকে যেতে গিয়ে প্যাসেজে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল মা-মেয়ে। অবাক হয়ে দেখল ঠাকুর্দার ছবি

দড়ি ছিঁড়ে পড়ে যাবার আগে যেখানে টাঙানো ছিল সেখানেই কেউ টাঙিয়ে দিয়েছে। নতুন বাঁধাই-করা ছবি। তবে যে গাবু বলল সাদা ফ্রেমের জন্যে দেরি হচ্ছে, কয়েকদিন পরে সে নিজেই বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাবে। তাহলে ? কে দিয়ে গেল এই ছবি ? গাবু বাজে কথা বলল কেন ? আর সাদা ফ্রেমও তো দেওয়া হয়নি। কালো, বেশ পুরু নতুন ফ্রেম।

মুনমুন বলল, 'বড় বাজে কথা বলে মা ছবির দোকানের লোকটা। দেখ, কালো ফ্রেমে বাঁধাই করেছে।'

মুনমুনের মা আস্তে বলল, 'তাই তো দেখছি।'

ওদের গলা শুনতে পেয়ে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে এল মুনমুনের বাবা। এসে বলল, 'একটা লোক একটু আগে দিয়ে গেল ছবিটা। নকুলের মা টাঙিয়ে দিয়েছে।'

মুনমুনের মা জিজ্ঞেস করল, 'কত টাকা দিয়েছ বাঁধাই-এর জন্যে ?'

'টাকা-পয়সার কথা তো কিছু বলল না। নকুলের মা দরজা খুলেছিল, লোকটা আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইল। কথা-টথা কিছু বলল না, নমস্কার করে ছবিটা দিয়েই চলে গেল।'

'তুমি কিছু জিজ্ঞেস করলে না তাকে ?'

'কী জিজ্ঞেস করব বলো ?'

'বাঃ ?' মুনমুনের মা দিশাহারার মতো বলল, 'লোকটা কী রকম দেখতে বলো তো ?'

মুনমুনের বাবা হেসে উঠল, 'এত জেরা করছ কেন ! ব্যাপারটা কী ?'

'আঃ, বলো-না !'

মুনমুনের বাবা একটু ভেবে বলল, 'রোগামতো একটা লোক। তবে বেশ লম্বা। গায়ের রঙ ফসই—হয়েছে ?'

মুনমুনের মা আর কোনো কথা বলল না। তবে প্যাসেজের দেয়ালে টাঙানো ঠাকুর্দার বড় ছবিটার দিকে তাকিয়ে তার বুকে যেন একটা কাঁটা খচখচ করে উঠছিল।

॥ ৩ ॥

গদা বেশ জোরে গাবুর পিঠ চাপড়ে বলল, 'শাবাশ গাবু ! যা একখানা খবর এনেছিস না—'

একদিন সোনারপুরে গিয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে

জমিদারবাড়িটা দেখে এসেছে গদা। দেখেশুনে তার আর সন্দেহ নেই যে সে-বাড়িতে গুপ্তধন আছে। একা-একা বাড়ির ভেতরে সে ইচ্ছে করেই ঢোকেনি, প্রথম থেকেই একটু সাবধান হওয়া দরকার। কারণ এই গুপ্তধনের সন্ধান আর কারুর জানা আছে—ছবি চুরি যাওয়াতে তা বেশ স্পষ্ট করেই বোঝা গেছে। শত্রুর সঙ্গে এবার তার বোঝাপড়া হবে।

তবে গদার মনে একটা অহঙ্কার আছে যে, হঠাৎ তার নাগাল পাওয়া কারুর কর্ম নয়। সে ধরাছোঁয়ার বাইরে। এবার সে যুদ্ধ করবে আরও সতর্কতার সঙ্গে—শত্রুকে বুঝিয়ে দেবে তার সঙ্গে গদার তফাত কোথায়। সোনারপুরের পোড়ো জমিদারবাড়িটা প্রথমে নিজের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে আসবে গদা, তারপর শুরু করবে তার কাজ।

গদা বোধহয় এখুনি বাইরে কোথাও বেরোবে। কিন্তু আজ তার সাজপোশাক একেবারেই অন্য রকম। গাবু হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে ছিল। খুব দামি ধুতি পরেছে গদা, গিলে-করা সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়েছে আর সরু একটা নকল গোঁফ লাগিয়ে নিয়েছে। তার হাতে ভারী সোনার আংটি, বিলিতি রিস্টওয়াচ।

'বেরুচ্ছ মামা?' গাবু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ—' গদা ঘড়ি দেখে বলল, 'এখন ন'টা পঁচিশ, তুই ঠিক দশটায় দোকান খুলবি—' সে কেসে গলা পরিষ্কার করে নিল, 'তোর সেই সোনারপুরের জমিদারনির ঠিকানা দুশো তেরো লেক ভিউ রোড তো?'

'হ্যাঁ মামা—' গাবু একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'সেখানে যাবে নাকি?'

'ভাবছি। ব্যস্, এখন আর কিছু জিজ্ঞেস করবি না আমাকে।'

গাবু দু-এক মিনিট চুপ করে থাকল। তারপর আরও একটু ইতস্তত করে খুব চাপা স্বরে বলল, 'একটা কথা তোমাকে বলা হয়নি মামা—'

পেরেকে টাঙানো ছোট একটা আয়নায় নকল গোঁফটা একটু ঠিক করে নিতে-নিতে গদা জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

'সেই মহিলা আবার এসেছিল দোকানে, আমার ওপর একটু রেগে গেছে মনে হল।'

গদা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কেন?'

'মানে, সেই ছবির ফ্রেমটা সাদা করতে বলেছিল আমাকে—'

গদা ধমক দিল গাবুকে, 'কী মিউমিউ করছিস সেই থেকে—আরে, ছবি তো হাওয়া, তার ফ্রেমের খবরে এখন দরকারটা কী তোর?'

'ছবিটা পাওয়া গেছে যে মামা।'

'পাওয়া গেছে! তা এত বড় খবরটা আমার কাছে চেপে রেখেছিস কেন? কেমন করে পেলি ছবি, বল?'

'আমি পাইনি মামা—' গাবু একটু থেমে ভয়ে-ভয়ে বলল, 'আমি তো বলেছিলাম ছবি কারখানায় আছে, তুমি যেমন বলতে বলেছিলে। কিন্তু কে একটা লোক ছবি বাঁধাই-টাঁধাই করে লেকভিউ রোডের বাড়িতে দিয়ে এসেছে।'

গদা চিৎকার করে উঠল, 'কে সেই রাস্কেল?'

'আমি কেমন করে বলব মামা? আমি তো বুঝতেই পারছি না এসব ভেল্কিবাজি কে দেখাচ্ছে!'

'তুই কী বললি জমিদারনিকে?'

'প্রথমে বুদ্ধু বনে গিয়েছিলাম, পরে বুদ্ধি খাটিয়ে বললাম, আমার লোকই গিয়েছিল, সাদা ফ্রেম না পেয়ে ওরা তাড়াতাড়ি যা পেয়েছে, দিয়েছে। ভদ্রমহিলা ড্যাবা-ড্যাবা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে টাকা দিয়ে চলে গেল।'

'হুঁঃ!' গদার মুখ কঠিন আর গম্ভীর হয়ে এল। সে ধপ্ করে বসে পড়ল তক্তাপোশের ওপর। অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। গাবু একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল তার মামার দিকে। সে দেখল, রাগে গদার চোখ ক্রমে ছোট হয়ে আসছে, কপাল কুঁচকে উঠছে।

তার সমস্ত শরীরটাই যেন শক্ত হয়ে যাচ্ছে।

একটু পরে গদা তার ডান হাত মুঠো করে ঘুসি পাকিয়ে বলল, 'খুব সাবধান গাবু ! এ রাস্কেল সাপের বাচ্চা। তবে জানে না কার সঙ্গে লাগতে যাচ্ছে। যেই হোক সে, তার বডি আমি একশো বত্রিশ টুকরো করে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেব। তুই চোখকান খোলা রাখবি। সব সময় লক্ষ করবি দোকানের বাইরে থেকে কে উঁকিঝুঁকি মারছে—'

'হ্যাঁ, মামা।'

'তুই যা এবার দোকানে, আমিও বেরোই—' সিল্কের পাঞ্জাবির পকেট থেকে সোনালি রঙের কেস বের করে সিগারেট ধরাল গদা, তারপর ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে হেলে-দুলে বেরিয়ে গেল। আর তাকে দেখতে-দেখতে গাবুর মনে হল তার মামাই যেন সোনারপুরের আসল জমিদার।

আকাশ কালো হয়ে আছে কিন্তু গুমোট গরম। গদার কপালে ঘাম জমে উঠছিল। এখন অফিসের সময়। রাস্তায় অনেক লোক। ট্যাক্সি, ট্রাম, মিনিবাস রাজ্যের লোক তুলে হু-হু করে ছুটে যাচ্ছিল। এদিকে-ওদিকে আর সামনে-পিছনে তাকাতে তাকাতে খুব সাবধানে হাঁটছিল গদা—এক-একবার ডান পকেটে রাখা দুটো বোমা হাত দিয়ে অনুভব করছিল। তার কোমরে ছোরা গোঁজা আছে একটা। এখন হয়তো আত্মরক্ষার এইসব অস্ত্রশস্ত্র গদার দরকার হবে না। না হোক। তৈরি না হয়ে সে এক পাও চলে না। পুলিশ কিম্বা তাদের চেলাচামুণ্ডা হুপ করে কোথা দিয়ে ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে কে জানে।

একটু দূরে নিরিবিলি জায়গায় একটা কালো রঙের গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল, তার কাছে গিয়ে দরজা খোলবার চেষ্টা করতেই ড্রাইভার রুক্ষ স্বরে বলে উঠল, 'এটা ভাড়ার গাড়ি নয় মশাই।'

যাক, ছট্টুও তাকে চিনতে পারেনি, গদার মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে বলল, 'লক্ খোল রে ছট্টু।'

'আরে গদাদা আপনি—' ছট্টু ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি গাড়ির দরজা খুলে বলল, 'চিনতেই পারিনি।'

গদা ইশারায় তাকে চুপ করতে বলে গাড়িতে উঠল। উঠে বলল, 'নম্বর প্লেটটা বদলে দিয়েছিস তো ?'

'রঙ করবার আগেই, কোথায় এবার বলুন দাদা ?'

গদা ঝুঁকে পড়ে আস্তে বলল, 'এই কাছেই যাব—লেক ভিউ রোডে। বাড়ির সামনেই গাড়ি রাখবি, বেশি দেরি হবে না আমার।'

ছট্টু কথা বলল না, শুধু মাথা নাড়ল।

লেকভিউ রোডে মুনমুনদের বাড়ি খুঁজে পেতে কোনো অসুবিধা হল না গদার, বাইরেই বেশ বড় করে নম্বর লেখা আছে। গদা বেল টিপতেই একটি বয়স্ক লোক এসে দরজা খুলল। খুলে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল গদার মুখের দিকে।

চাকর-টাকর হবে হয়তো। গদা ভাবল, তার রূপ দেখে ট্যারা হয়ে গেছে। সে মিষ্টি হেসে খুব নরম করে বলল, 'বৌদি বাড়িতে আছেন ?'

'আজ্ঞে আছেন। বসুন বাবু, আমি খবর দিচ্ছি—'

কয়েক মিনিট পরেই নীচে নেমে এল মুনমুনের মা। গদা উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করে হাসল, 'অসময়ে বিরক্ত করতে এলাম আপনাকে—'

'বসুন, বসুন—' কিছু বুঝতে না পেরে মুনমুনের মা বলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো ?'

গদা কী বলবে মনে মনে কিছু সময় ভাবল। পকেট থেকে রুমাল বের করে আলতোভাবে গলার ঘাম মুছল। পরে বলল, 'আমাকে মাপ করবেন, শুধুমাত্র দেশের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার কথা ভেবে কোনো খবর-টবর না দিয়ে আপনার সাহায্যের জন্যেই চলে এলাম।'

মুনমুনের মা বুঝতে পারল না, আসলে কী চায় গদা। মনে মনে বেশ অপ্রস্তুত হয়ে সে

বলল, 'মিস্টার চ্যাটার্জি তো এখন বাড়িতে নেই, অফিসে বেরিয়ে গেছেন।'

গদা মাথা নাড়তে নাড়তে হাসল। 'না না, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলার দরকার নেই আমার। আমি আপনার সাহায্যের জন্যেই এসেছি মিসেস চ্যাটার্জি।'

এখনো মুনমুনের মা বুঝতে পারল না গদা কী বলতে চায়। ভাবল, সে হয়তো মোটা টাকা চাঁদা চেয়ে বসবে। দিনকাল ভাল নয়, অচেনা লোকের সামনে বসে থাকতে ভয় হল মুনমুনের মার। লোকটার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বাইরে, চেহারাও বনেদি। এই রকম লোককে দেখে ভয় পাবার কোনো মানে হয় না।

মুনমুনের মা সহজ হওয়ার চেষ্টা করে নরম হেসে বলল, , 'বলুন, কী সাহায্য আপনি চান আমার কাছে?'

গদা চুপচাপ আবার ভাবল কিছু সময়। ভেবে বলল, 'আমার সামান্য পরিচয় আগে দিই আপনাকে—' সে অমায়িক হাসি হাসল, 'আমার নাম ভূমেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী। না না, নাম শুনে আমাকে আপনাদের মতো বড় জমিদার-টমিদার ভাববেন না। হেঁ-হেঁ, আমি খুব সাধারণ লোক, একটু-আধটু সমাজের কাজ করি শুধু। আচ্ছা মিসেস চ্যাটার্জি, সোনারপুরে আপনার একটা বাড়ি আছে, না?'

'হ্যাঁ আছে। আমাদের পৈতৃক বাড়ি।'

'সে-বাড়িতে আপনারা তো আর বাস-টাস করেন না?'

মুনমুনের মা মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

'বাড়িটা আমি বাইরে থেকে দেখেছি। স্কুল করবার পক্ষে খাসা বাড়ি। আপনি অনুমতি দিলে গরিব ছেলেমেয়েদের শিক্ষার একটা ব্যবস্থা হয়।'

'বেশ তো, আমি আমার স্বামীর সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি।'

গদা উৎসাহ প্রকাশ করে বলল, 'নিশ্চয়। বাড়িটা অযত্নে একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা সব ঠিক করে নেব। সরকারও আমাদের নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।'

'করা তো উচিত।'

'কিছু মনে করবেন না মিসেস চ্যাটার্জি—'

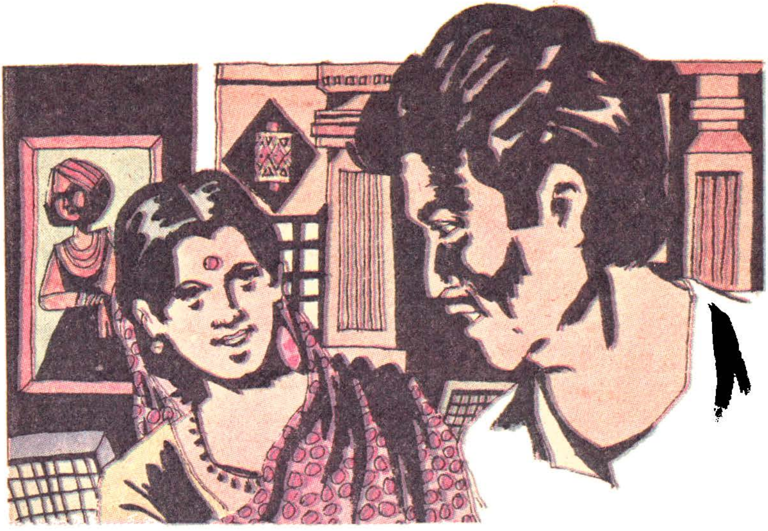

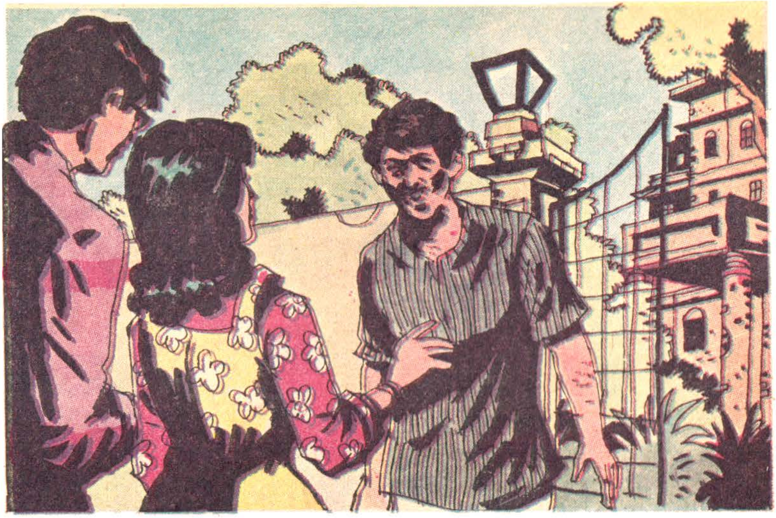

গদা একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমরা মাসে-মাসে আপনাকে যৎসামান্য ভাড়াও দিতে পারব আশা করি।'

মুনমুনের মা প্রবল আপত্তি জানাল, 'এসব বলবেন না, এত বড় কাজে নামতে যাচ্ছেন আপনারা—'

'মাপ করবেন—' গদা বলল হাত জোড় করে, 'কত বড় বংশের মেয়ে আপনি! কথাটা বললাম কেমন করে—আশ্চর্য! একটা কথা, আপনাদের বংশের কারুর নামে স্কুলের নামকরণ হবে, দয়া করে একটা নাম ভেবে রাখবেন।'

মুনমুনের মা কিছু না ভেবে বলল, 'আমাদের বংশের কারুর নামে হলে ঠাকুর্দার নামেই হওয়া উচিত—শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।'

'বেশ, বেশ। সুন্দর নাম। শ্রীনাথ বিদ্যালয়—' গদা উঠে দাঁড়াল, 'উঠি। অনেক সময় নষ্ট করে গেলাম আপনার।'

'না-না।'

হঠাৎ কী ভেবে গদা বলল, 'যাই ঠিক করুন না কেন, চলুন বাড়িটা একদিন আপনাদের সঙ্গে গিয়ে ভাল করে দেখে আসি। খেলাধুলোর ব্যবস্থা কী করা যায়, কোন্ ঘরটা লাইব্রেরি হবে, কটা ক্লাস খোলা হবে প্রথমে—এইসব আলোচনা যথাস্থানে গিয়ে সব দেখতে-দেখতে করলে ভাল হয় না?'

মুনমুনের মা বলল, 'রবিবারে আমরা যাচ্ছি। মুনমুন—মানে আমার মেয়ে বড় ধরেছে। সকালে গিয়ে সন্ধেবেলা ফিরে আসব। যাবেন আপনি?'

'তা যেতে পারি। রবিবারে, না? কখন গিয়ে পৌঁছবেন আপনারা বলুন?'

'সকাল নটা-দশটায়।'

গদা বলল, 'আমি ঠিক দশটায় যাব, ঘণ্টাখানেক থাকব। সেদিন আবার আমার মিটিং-টিটিং আছে। যা বন্যা হয়ে গেল উত্তরবঙ্গে! সেই ব্যাপারেই সভার আয়োজন করা হয়েছে। আচ্ছা—' সে নমস্কার করল আবার। বলল, 'বড় খুশি হলাম আপনার ব্যবহারে।'

মুনমুনের মা হাসল। গদা এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। কালো গাড়িটা হুস করে

মিলিয়ে গেল। আর ঠিক তখন মুনমুনের মা শুনল, 'কেলা, পেয়ারা! কেলা, পেয়ারা! কাশীর পেয়ারা জোড়া চালিশ!'

মুনমুনের মা দেখল বাড়ির সামনে ঝুড়ি মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে একটা ফলওলা। সে বলল, 'চাই মা?'

মুনমুনের কথা ভেবে তার মা ফলওলাকে ভেতরে আসতে বলল। সে এল না। বলল, 'পাশের বাড়ি ডাকল মা, আমি আসছি—এক মিনিট।' মুনমুনের মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল বেশ কিছুক্ষণ ফলওয়ালার আশায়, কিন্তু সে আর এল না। তখন বিরক্ত হয়ে দরজা বন্ধ করে দিল মুনমুনের মা। আর দিয়েই তার মনে হল, বড় চেনা-চেনা মুখ ফলওলার—কোথায় তাকে দেখেছে যেন! এ পাড়ায় এর আগে কখনো আসেনি। তাহলে কোথায় দেখেছে তাকে? মুনমুনের মা হঠাৎ কিছু মনে করতে পারল না।

॥ ৪ ॥

রবিবারে সোনারপুরে বাড়ির সামনে পৌঁছতে বেশ দেরি হয়ে গেল মুনমুনদের। বর্ষাকাল বলে গাড়িতে আসেনি ওরা, বালিগঞ্জ স্টেশন থেকে ট্রেন ধরে এসেছে। আগের স্টেশনে কী একটা গোলমালের জন্যে ট্রেন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, তাই দেরি হল।

আজ বৃষ্টির চিহ্ন নেই। খটখটে রোদ উঠেছে। ভীষণ গরম। এখন সকাল সাড়ে দশটা বাজে। সোনারপুর স্টেশন থেকে একটা সাইকেল রিকশ নিয়ে প্রায় মাইলখানেক আসতে হয়েছে ওদের।

উঁচুনিচু কাঁচা আর পাকা রাস্তা ধরে রিকশয় আসবার সময় মুনমুনের মা চারপাশে তাকিয়ে বিভোর হয়ে গিয়েছিল। কলকাতার এত কাছে সোনারপুর—কিন্তু কী আশ্চর্য অন্যরকম। মুনমুনের মা ওপরে তাকিয়ে দেখল কত বড় আকাশ। রাস্তার এপাশে-ওপাশে ধানের খেত, হাওয়ায় ধানশিষ দুলে দুলে উঠছে। কোথাও-কোথাও দুটো বাঁকা নারকেল গাছ নুয়ে পড়ে একটার সঙ্গে আর একটা এক হয়ে গেছে—তোরণের মতো দেখাচ্ছে। ভেসে আসছে একটানা পাখির ডাক। মাটির সোঁদা গন্ধে মুনমুনের মার ছোটবেলার কথা বড় বেশি করে মনে পড়ছিল।

জমিদারবাড়ির ভেঙে পড়া গেটের সামনে রিকশ দাঁড়াতেই জীবন এগিয়ে এল তাড়াতাড়ি। মুনমুনকে হাত ধরে নামিয়ে তার মাকে বলল, 'এবার অনেক দিন পরে এলে দিদি, শরীরটা ভাল তো জামাইবাবু? মুনমুন-মা আমার কত বড় হয়ে গেছে!'

মুনমুনের মা আর বাবা রিকশ থেকে নামল। এদিক-ওদিক দেখল। মুনমুনের মা জিজ্ঞেস করল জীবনকে, 'কেউ এসেছিল আজ আমাদের সঙ্গে দেখা করতে?'

'না তো দিদি—' জীবন ওদের বড় ব্যাগ আর টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

এ-বাড়ির নীচের দুটো ঘর এখনো বাসযোগ্য। আয়না আলমারি চেয়ার টেবিল খাটও আছে—যদিও সেসব বহু পুরনো, বোধহয় মুনমুনের মার ঠাকুর্দার আমলের।

বাড়ির সামনে অনেকটা জমি। একদিকে ভাঙাচোরা আস্তাবল, পাইক-বরকন্দাজ, লাঠিয়ালের ঘর। এখন এসব জরাজীর্ণ, কোনদিন হয়তো হুড়মুড় করে ধসে পড়বে। গোটা বাড়ির চারপাশ এককালে পাঁচিল-ঘেরা ছিল। আজ পাঁচিলের কোনো-কোনো অংশের চিহ্ন নেই, যেটুকু আছে সেখানেও ফাটল ধরেছে। দোতলা বাড়ি, বড় বড় ঘর। পিছনে লম্বা বারান্দা, বড় বড় থাম। তবে দোতলায় ওঠার কথা আজকাল আর কেউ ভাবে না, কারণ সিঁড়ির বেশ খানিকটা অংশ ধসে পড়েছে। দোতলার অবস্থা একেবারেই কাহিল। ঘরের মেঝেতে গর্ত, ওপরে ফুটো। জানলা-দরজা নেই বললেই চলে।

মুনমুনরা ভেতরে ঢুকতে যাবে, এমন সময় ভাঙা গেটের সামনে একটা কালো গাড়ি এসে দাঁড়াল। ব্যতিব্যস্ত হয়ে নামল গদা, পড়ি-কি-মরি এসে দাঁড়াল মুনমুনের মা-বাবার

সামনে। লজ্জা-লজ্জা মুখ করে বলল, 'বড় দেরি হয়ে গেল আমার। জলে-কাদায় রাস্তার যা অবস্থা হয়েছে, গাড়ি আর চলতে চায় না—'

'আমরা ট্রেনে এসেছি—' মুনমুনের মা বলল, 'এই যে, ইনি মিস্টার চ্যাটার্জি আর উনি ভূমেন্দ্রনারায়ণবাবু—'

'আপনার কথা শুনলাম, খুব খুশি হলাম।' হাসল গদা, 'এখন মিসেস চ্যাটার্জির দয়া হলে আমরা কাজে নামতে পারি।'

'ও-কথা বলবেন না—' মুনমুনের মা লজ্জা পেয়ে বলল, 'কত বড় কাজ করতে যাচ্ছেন আপনি!'

'হেঁ-হেঁ, অবোধ শিশুদের কথা ভেবে—' গদা পলকে তার দামি রিস্টওয়াচের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'চলুন, বাড়িটা একটু দেখে নি।'

'আগে একটু চা-টা খাবেন, আসুন ভূমেনবাবু—' গদার মুখের দিকে তাকিয়ে মুনমুনের বাবা হেসে বলল।

'না-না, মাপ করবেন। আজ না। আমার একটা মিটিং আছে। আজ বড় ব্যস্ত, আর একদিন—'

গাড়িবারান্দা পার হয়ে বাড়ির ভেতরে ঢোকবার ঠিক আগে হাঁ-হাঁ করে কাঁদতে-কাঁদতে একটা পাগল ছুটে এসে গদার পায়ের ওপর পড়ল, 'আমাকে বাঁচান রাজাবাবু!'

পাগলকে দেখে মুনমুন ভয় পেয়ে শক্ত করে তার মার হাত ধরল। গদা হকচকিয়ে গেল। আর মুনমুনের বাবা জীবনকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'এ কোথা থেকে এল?'

জীবন হেসে বলল, 'এই তো দু-একদিন হল একে দেখছি। দারোগাবাবুর কাছে গিয়ে নালিশ করেছে—কেউ নাকি ওকে খেতে দেয় না। কোথাকার পাগল কে জানে, রেলগাড়ি থেকে নেমে পড়েছে।'

পাগল তখনো গদার পায়ে মাথা ঠুকছে, 'ও রাজাবাবু, ভগবান আছে—বাঁচান, আমাকে বাঁচান!'

মনে মনে গদা মহা বিরক্ত। কোথা থেকে এসে জুটল এই আপদটা। তাহলেও এদের সামনে সে মিষ্টি হেসে পাগলকে বলল, 'এই পা ছাড়। ওঠ। কী হয়েছে তোর?'

পাগল গদার পা ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে হঠাৎ নাচতে শুরু করে দিল। তারপর নাচতে নাচতে চলতে লাগল এদের সঙ্গে। তার হাতে একটা বাঁশের বাঁশি। এক-একবার সে সেটা পি-পি করে বাজাচ্ছে।

জীবন বলল, 'এমন করেই পাগলটা ঘুরে বেড়ায় দিদি। মাঝে মাঝে ভেউ-ভেউ করে কাঁদে। আজ সকালে এসে দেখি দালানে শুয়ে আছে।'

পাগলকে নিয়ে গদার একটুও মাথাব্যথা নেই। বাড়ির ভেতরে ঢুকে সে প্রশস্ত উঠোন খুব মন দিয়ে দেখছিল। উঠোনের শেষ প্রান্তে একটা পেয়ারাগাছ। আর তার পাশেই কুয়ো। একটা লোহার পাত দিয়ে কুয়োর মুখ চাপা আছে।

উঠোন দেখে কুয়োর দিকে এগিয়ে যেতে যেতে গদা খুশি হয়ে বলল, 'বাঃ, স্কুলের পক্ষে খাসা বাড়ি। এই উঠোন হবে ছাত্রদের খেলার মাঠ। মনের সুখে হৈচৈ করবে ওরা—' কুয়োর ডানদিকে এক-এক পা করে গুনে গুনে কুড়ি পা হেঁটে গদা থামল। ঘন কচুবন আছে একটা। তার আশেপাশে আগাছা। বর্ষার জন্যে মাটি বেশ নরম। লোভে গদার চোখ দুটো চকচক করে উঠল। লোক দিয়ে আগে আগাছা-টাগাছা সাফ করিয়ে নিতে হবে, কিন্তু আসল জায়গার মাটি খুঁড়বে গাবু ছট্টু জহর আর সে নিজে।

কুয়োর কাছাকাছি দাঁড়িয়ে বাড়ির দোতলায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে গদা বলল, 'এই কুয়োটার জন্যে একটু মুশকিল হবে। মানে, অনেক দুষ্টু ছেলে থাকে তো। লোহার পাতটা সরিয়ে ফেলতে কতক্ষণ!'

মুনমুনের মা বলল, 'ঠিক বলেছেন। কুয়োর জল কেউ আর ব্যবহার করে না। ওটা একেবারে বুজিয়ে দিতে হবে।'

পাগলটা বাঁশি বাজিয়ে দিল পি-পি করে।

তারপর টানাটানি করে লোহার পাতটা সরিয়ে ঝুঁকে পড়ল কুয়োর ওপর। কেঁদে-কেঁদে বলল, 'জল খাব, আমি জল খাব।'

'এই এই, পড়ে যাবি যে—' গদা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে জোরে ধাক্কা মেরে তাকে সরিয়ে দিল। তারপর পাতটা টেনে দিল কুয়োর ওপর।

ড়করে কেঁদে উঠল পাগল, গদার পায়ের ওপর আবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে বলল, 'আপনি আমায় মারলেন রাজাবাবু!'

গদা তাকে ধমক দিয়ে বলল, 'ভাগ এখান থেকে—' সে আর একবার ঘড়ি দেখে মৃনম্নের মার দিকে তাকিয়ে হাসল, 'চলুন, এবার ওপরটা একবার দেখে আসি?'

মৃনম্নের বাবা বলল, 'নীচ থেকেই দেখতে হবে ভূমেনবাবু, ওপরে ওঠার উপায় নেই। দেখছেন না, সিঁড়ি একেবারে ভাঙা।'

গদা শুনল। শুনে মনে মনে হাসল। ওসব ভাঙা সিঁড়ি-টিড়ি তাকে কি আর ঠেকিয়ে রাখতে পারে! ওপরটা তাকে দেখতেই হবে। সেখানে যখন অন্য কারুর পক্ষে যাওয়া মুশকিল তখন সুবিধামতো তো একটা ঘরে তাকে মাটি খোঁড়ার সরঞ্জাম—শাবল, গাঁইতি আর কোদাল জড়ো করে রাখতে হবে। আর দলবলসুদ্ধ তাকেও আস্তানা গড়তে হবে ওই ওপরেই। দিনের বেলায় মাটি খুঁড়ে ধনরত্নের সন্ধান করা সম্ভব নয়, তাহলে ওরা ধরা পড়ে যাবে। ওদের কাজ সারতে হবে গভীর রাতে। এক রাতে না হলেও দু-রাতের মধ্যে কাজ নিশ্চয়ই চুকে যাবে।

এদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে গদা দালানে উঠল, পরে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল সিঁড়ির কাছে। কয়েক ধাপ উঠে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। আর সিঁড়ি নেই, ভেঙে গেছে। গদা মৃনম্নের মা-বাবার দিকে দেখল। দেখে হাসল। তারপর ধুতি একটু গুটিয়ে লাফ দিয়ে উঠে এল দোতলার বারান্দায়। পাগলাটা জোরে হাততালি দিয়ে পি-পি বাঁশি বাজাল।

মৃনম্নের মা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল

গদার দিকে। তার বাবা গদাকে লক্ষ করে বিচলিত হয়ে উঠল, 'নামবেন কেমন করে ভূমেনবাবু ? অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে যে ?'

গদা হেসে বলল, 'ছোটদের শিক্ষার কথা ভেবে একটু রিস্ক না নিলে চলবে কেন মিস্টার চ্যাটার্জি, ওপরটা একবার ঘুরে দেখেই সশরীরে আমি নেমে যাব দেখবেন।'

মুনমুনের মা আস্তে তার বাবাকে বলল, 'কী মহৎ লোক দেখেছ ! ছোটদের শিক্ষার কথা ভেবে বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিতে ভয় পায় না।'

পাগলটা হেসে উঠল হি-হি করে। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

গদা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল তার দিকে। তারপর বারান্দা ধরে একটু এগিয়ে ডানদিকে ঘুরল। একটা ঘর আছে একেবারে শেষ প্রান্তে। গদা সেই ঘরে ঢুকল। বেশ বড় ঘর। তবে এখানে-ওখানে অনেক রকম জঞ্জাল জমেছে। ভাঙা টুল, মরচে ধরা পিচকিরি, বালতি, কাগজের স্তূপ, হাত-পা ভাঙা পুতুল আরও কত কী। ভ্যাপসা একটা গন্ধ উঠছে ঘর থেকে। মাথার ওপর পায়রা বকম-বকম করছে—ডানা ঝাপটাচ্ছে।

দুর্গন্ধে গদার নাক জ্বলে গেলেও এ-ঘরটাই তার পছন্দ হল সবচেয়ে বেশি। তার একটা মস্ত কারণ আছে। একটাই জানলা এই ঘরের। সেই পাল্লা-ভাঙা জানলা দিয়ে কচুবনে ঢাকা আসল জায়গাটা স্পষ্ট দেখা যায়। কাজেই দু-রাতের জন্যে দলবল নিয়ে গদাকে এই ঘরেই থাকতে হবে। এবং দেরি একেবারেই করা চলবে না, খুব তাড়াতাড়ি কাজে নামতে হবে। কোথা থেকে কী অঘটন ঘটে যায় ঠিক কী। স্কুল করবার ছুতোয় যখন এই বাড়িতে ঢোকবার ব্যবস্থা সে করতে পেরেছে তখন তার ভাবনা কী।

যেমন করে গদা উঠেছিল দোতলায় ঠিক তেমন করেই আবার লাফ দিয়ে নেমে মুনমুনের মা-বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'অপূর্ব ! অপূর্ব ! এমন স্কুলবাড়ি কোথাও পাওয়া যাবে না।'

মুনমুনের মা সপ্রশংস চোখে গদার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনার জন্যেই তো বাড়িটা এবার সত্যি একটা ভাল কাজে লাগবে। এখানে আমাদের চেনাশোনা সকলকে আজই আমি সুখবরটা দিয়ে যাব ভাবছি। শুনলে সকলেই খুব খুশি হবে।'

মুনমুনের মার কথা শুনে মনে মনে বেশ ঘাবড়ে গেল গদা। এখন লোক-জানাজানি হলে সে মুশকিলে পড়তে পারে। কেউ যদি তাকে চিনে ফেলে তাহলেই তো হয়ে গেল। আর এক পা-ও এগোবার উপায় থাকবে না। তাছাড়া লোকে তাকে স্কুলের সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন করতে পারে। সে-সবের ঠিক ঠিক উত্তর তো সে দিতে পারবে না।

এইসব কথা ভেবে গদা হাত নেড়ে মুনমুনের মা-কে বলল, 'না-না-না, ও-কাজটি দয়া করে ভুলেও করবেন না। অন্তত কিছুদিন কাউকে একটি কথাও বলবেন না আমাদের এই স্কুলের ব্যাপারে—' কথা বলতে বলতে তার মুখে বিষণ্ণ একটা ছায়া নামল, 'কতবার যে আমার সব পরিশ্রম শুধু এই বলাবলি করতে গিয়ে পণ্ড হয়েছে—' করুণ একটা নিশ্বাস ফেলে সে থেমে থেমে বলল, 'জানেন, মানুষ বড় ঈর্ষাকাতর। ভাল একটা কাজের কথা শুনলে তারা বাধা দেয়।'

মুনমুনের বাবা বলল, 'ঠিক, ঠিক।'

পাগলাটাও বলে উঠল, 'ঠিক ঠিক।'

মুনমুনের ভয় বোধহয় একেবারে ভাঙল এতক্ষণে, পাগলের রকম দেখে সে ফিক করে হাসল।

গদা বলল মুনমুনের বাবাকে, 'আপনার সঙ্গে আলাপ হল. বাড়িটাও দেখা হয়ে গেল ভাল করে। শিক্ষা দপ্তরের কাউকে একদিন ধরে আনতে পারলেই হয়।'

'আমরাও চেষ্টা করব—' মুনমুনের মা বলল।

'বেশ তো—' গদা কুয়োর দিকে আঙুল দেখিয়ে কয়েক পা এগিয়ে গেল, 'উঠোনটা পরিষ্কার করা দরকার আগে, আমি আসব মাঝে মাঝে।'

READY, STEADY, GO!

WITH

Jalans SCHOOL BAG

★ It is for you, light as you wanted it to be, but roomy enough for all your books, tiffin box, pencil box and even comics.

Created in colours of Cherry Navy blue, Green..........to match your School Uniform and likes. Carry it anywhere you want after school to swim, picnics or even a short holiday.

like it? Now get your folks to present you one on your birthday.

★INDIA'S First Moulded School Bag made for you by—

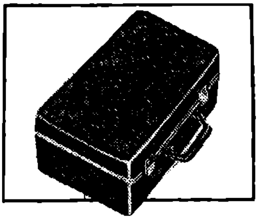

SHREE LAXMI ENTERPRISES

2, LALBAZAR STREET, CALCUTTA-700 001

'জীবনই তো করে দিতে পারে—' মুনমুনের বাবা জীবনের দিকে তাকিয়ে হাসল।

'হ্যাঁ হ্যাঁ।'

গদাও হাসল, 'মিস্তিরি-টিরি নিয়ে আমাকেও আসতে হবে মাঝে মাঝে। সব সারিয়ে-টারিয়ে নিতে কত খরচ হবে তা জানা দরকার তো।'

'তা তো বটেই—' মুনমুনের মা কী ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বলল, 'কিন্তু এই বাড়ি সম্পর্কে দু-একটা কথা আপনাকে বোধহয় বলা দরকার—'

'বলুন না, কী কথা ?'

'সে অনেক কথা। আমাদের পূর্বপুরুষের ইতিহাস।'

'বেশ তো, আমি নিশ্চয়ই শুনব—' গদা স্বরে বিনয় প্রকাশ করে বলল, 'আজ ওই মিটিংটা আছে কিনা—'

'আমাদের লেকভিউ রোডের বাড়িতে আসুন না যত তাড়াতাড়ি হয়—'

'কবে যাব বলুন ?'

মুনমুনের মা আর একবার বলল, 'যত তাড়াতাড়ি হয়। কালই আসুন-না বিকেলের দিকে। আমার কথা না শুনে স্কুলের ব্যাপারে এগোবেন না যেন !'

গদার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। মুনমুনের মার মুখের কাতর ভাব লক্ষ করে সে জিজ্ঞেস করল, 'কী ব্যাপার বলুন তো ? আপনি যেন হঠাৎ নার্ভাস হয়ে পড়ছেন ?'

'কাল আসুন, সব বলব—' মুনমুনের মা কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে বেশ করুণ স্বরে বলল, 'বাড়িটার ওপর যেন কারুর অভিশাপ আছে। ছোট ছোট ছেলেদের যেন কোনো ক্ষতি না হয়—'

এবার নিশ্চিন্ত হয়ে জোরে হেসে উঠল গদা, 'কোনো ক্ষতি হবে না। ওসব কুসংস্কারের কথা ভাববেন না। যাক, কাল শুনব আপনার সব কথা—' একটু থেমে বলল, 'তবে বিকেলে নয়, আমি সন্ধেবেলা যাব, হেঁ-হেঁ ! আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। আজ চলি।'

মুনমুনের মা-বাবাকে হাত তুলে বিনীত ভঙ্গিতে নমস্কার করে গদা তার কালো গাড়িতে উঠল, গাড়ি চলতে লাগল সঙ্গে সঙ্গে। আর বাঁশি বাজাতে বাজাতে পাগলটা ছুটতে থাকল গাড়ির পেছন-পেছন। ছুটতে-ছুটতে কত দূর সে গেল কে জানে। তবে এদিকে আর ফিরে এল না।

বিকেল অবধি সেদিন মুনমুনরা ছিল সোনারপুরে। মুনমুনের দাদুর চেনাশোনা কয়েকজন বয়স্ক লোক দেখা করতে এলেন তার মার সঙ্গে। তাঁরা অনেক করে বললেন সকলকে তাঁদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করতে। মুনমুনের মা রাজি হল না। বলল, 'আকাশ কালো হয়ে আসছে, আজ তাড়াতাড়ি ফিরে যাব। আবার আসব শিগগির, তখন ঠিক যাব।'

মুনমুনের আজ নতুন করে সোনারপুর ভাল লাগছিল। একসঙ্গে এত গাছ সে কখনো দেখেনি—এত বড় বাড়িতে বেশিদিন থাকেওনি কখনো। পুকুর, ধানখেত, পুকুরের জলে কাঁপা-কাঁপা গাছের ছায়া তাকে যেন দূর কোন্ স্বপ্নের দেশে নিয়ে যাচ্ছিল।

মুনমুনের মা-বাবারও এবার সোনারপুরের পরিবেশ বড় ভাল লেগেছিল। কলকাতায় লেকভিউ রোডের বাড়িতে ফিরে চায়ের টেবিলে মুনমুনের বাবা বলল, 'কাল থেকে ছ' দিনের ছুটি নিয়েছি, একটু বিশ্রামের দরকার। চলো না সোনারপুরে গিয়ে দু-তিনদিন থেকে আসি ?'

মুনমুনও লাফিয়ে উঠল, 'যাবে মা ?'

মুনমুনের মা বলল, 'যাব তো। কিন্তু তোমার স্কুল ?'

'বুধবার জন্মাষ্টমীর ছুটি, আর পরদিন তো আমাদের এমনিতেই বন্ধ। চলো-না মা, ওখানে বসে তাহলে আমি এসে-টা লিখে ফেলি ?'

'কী এসে ?'

'রুর‍্যাল লাইফ। মিসেস খারাস্ লিখতে

বলেছেন।'

মুনমুনের মা তার বাবার দিকে ফিরে খুব আস্তে বলল, 'কিন্তু কী সব কাণ্ড হয় যে ও-বাড়িতে! যদি আমরাও সে রকম কিছু—'

মুনমুনের বাবা বাধা দিয়ে হেসে বলল, 'আমরা কি কখনো কিছু দেখেছি? আমি তো জমিদারবংশের কেউ নই, আর তুমিও এখন অন্য বাড়ির লোক। কাজেই জীবনকে কাল খবর পাঠিয়ে দাও। পরশু সকালে চলো বেরিয়ে পড়ি দু-তিনদিনের জন্যে।'

মুনমুনের মা খুব নিচুস্বরে যেন বড় অনিচ্ছায় বলল, 'চলো।' আরও পরে যখন ঝমঝম করে আকাশভাঙা বৃষ্টি নামল আর সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে এল তখন টেলিফোন বেজে উঠল। মুনমুনের মা কয়েক পা এগিয়ে এসে রিসিভার তুলে নিয়ে বলল, 'হ্যালো?'

খুব মিষ্টি করে কেউ বলল, 'আমি মুনমুনের মার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

'আমিই বলছি। আপনি?'

'ও, নমস্কার। আমাকে আপনি চিনবেন না, আমি কে, তা বলবার এখন একটু অসুবিধা আছে—'

এসব কথা কী-রকম গোলমেলে মনে হল মুনমুনের মার, যে কথা বলছে তার গলার স্বরও একেবারে অচেনা। মনে মনে বেশ আতঙ্কিত হয়ে মুনমুনের মা বলল, 'বলুন কী বলবেন?'

'শুনুন, আমি খোলাখুলি আপনাকে একটা অনুরোধ করছি, আপনার সোনারপুরের বাড়িতে কোনো কারণেই কাউকে আর ঢুকতে দেবেন না। ইস্কুল-টিস্কুলের কথা একেবারে বাজে, ওসব কথা শুনে কাউকে বিশ্বাস করবেন না।'

একটা অশুভ আশঙ্কায় মুনমুনের মার বুক কেঁপে উঠল। কয়েক মুহূর্ত সে কোনো কথা বলতে পারল না, পরে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু আপনি কে?'

সেই লোক হাসল, 'বললাম তো, এখন আমার পরিচয় দেয়ার একটু মুশকিল আছে। তবে আর খুব বেশি দেরি হবে না, শিগগিরই আমি আপনাদের সামনে গিয়ে দাঁড়াব। শুনুন, দয়া করে আমাকে বিশ্বাস করুন! আপাতত আপনাদের পরিবারের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বলেই আমাকে মনে করবেন।'

মুনমুনের মা ভাঙা-ভাঙা স্বরে ভয়ে-ভয়ে বলল, 'কিন্তু আমাদের কোনো বিপদ হবে না তো?'

'কোনো বিপদ হবে না, নিশ্চিন্ত থাকুন।'

'আমরা দু-চারদিনের জন্যে সোনারপুরে যাচ্ছি, পরশু সকালে—যাব কি?'

'নিশ্চয়ই যাবেন। তাহলে ভালই হবে। সেখানেই হয়তো আমি আপনাদের দেখা দিতে পারি—' লোকটি একটু থামল, পরে বেশ জোর দিয়ে বলল, 'স্কুল খোলার ব্যাপারে বাড়ি দিতে কিছুতেই রাজি হবেন না। আবার বলছি, কাউকে ভেতরে ঢোকবার অনুমতিও দেবেন না।'

'কিন্তু আমি যে কথা দিয়ে দিয়েছি।'

লোকটি দৃঢ়স্বরে বলল, 'কথা ফিরিয়ে নেবেন। সেই ভদ্রলোক কাল সন্ধ্যাবেলা যখন আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তখন তার মিষ্টি কথায় ভুলবেন না, পরিষ্কার তাকে জানিয়ে দেবেন যে আপনারা ঠিক করেছেন সোনারপুরে নিজেরা গিয়ে থাকবেন—ইস্কুল-টিস্কুল এখন হবে না।'

মুনমুনের মা মনে মনে খুব অবাক হয়ে মুখে বলল, 'কিন্তু আপনি কী করে জানলেন কাল ভূমেনবাবু আমাদের এখানে আসবে?'

টেলিফোনে হাসির শব্দ খেলে গেল। লোকটি আরও মধুর করে বলল, 'সত্যি আমি আপনাদের বন্ধু। আপনাদের সব খবর আমি রাখি। আচ্ছা, আজ ছাড়ি। খুব শিগগিরই দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে। নমস্কার!'

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে মুনমুনের মা একটা পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। তার বুক কাঁপছে, মাথা ঘুরছে, চোখে অন্ধকার-অন্ধকার লাগছে। এতদিন পর তার পৈতৃক অভিশপ্ত

বাড়ি নিয়ে কী যে কাণ্ড-কারখানা শুরু হয়েছে তা সে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না, আর ঠিকও করতে পারল না এখন কী করবে—যে টেলিফোন করল তাকে বিশ্বাস করে তার কথামতো কাজ করবে কিনা।

মুনমুনের মা আস্তে আস্তে পা ফেলে শোবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। মুনমুনের বাবাকে ব্যাপারটা জানানো দরকার। ঘন ঘন মেঘ ডাকছে। বাজ পড়ল কাছাকাছি কোথাও। বৃষ্টি আরও জোরে এল।

॥ ৫ ॥

পরদিন সোমবার। রাত প্রায় এগারোটা। এখন রাস্তা একেবারে ফাঁকা। লোক-চলাচল নেই বললেই চলে। ঝিরঝির বৃষ্টি হয়ে গেছে একটু আগে। চারপাশ অন্ধকার, আলো-টালো কিছু নেই। গাবুর ছবি বাঁধাই-এর দোকানের দরজা বেশ ভাল করে বন্ধ। আলোও নেভানো। শুধু একদিকে মিটমিট করে বেশ বড় আর মোটা একটা মোমবাতি জ্বলছে।

দোকানের ভেতরে মাদুরের ওপর চারজন বসে আছে। গদা, গাবু, ছট্টু আর জহর। জহরের চোখ দুটো ছোট ছোট, লম্বা কান, কপালের বাঁ দিকে কাটা দাগ, মুখের ভাব হিংস্র। জহরের গলার স্বর বড় কর্কশ।

চাপা স্বরে জহর প্রথম কথা বলল, 'কী হুকুম গদাবাবু, হঠাৎ জরুরি তলব ?'

দাঁতে দাঁত চাপল গদা। মাটিতে ঘষে ঘষে সিগারেট নিভিয়ে ফেলে একটা হাত মুঠো করে বলল, 'বাড়িউলি ল্যাজে খেলাচ্ছে আমাকে। জানে না কার সঙ্গে মোকাবিলা করতে যাচ্ছে। তেমন বুঝলে গুষ্টিসুদ্ধ ফিনিশ করে দেব রাতারাতি।'

'কী হল ?'

'আরে কাল পাকা কথা হয়ে গেল তার সোনারপুরের বাড়িতে ঢুকব দরকারমতো—আজ এক কথায় সব ভেস্তে দিল। বলল, ওখানে ঢোকা-টোকা চলবে না। কাল থেকে তারা গিয়ে থাকবে সেখানে—'

'তা থাক-না—' মুখ দিয়ে অদ্ভুত একটা শব্দ করে জহর বলল, 'কে থাকল না-থাকল তাতে আমাদের ইয়ে—ভারী বয়েই গেল। আমরা কি কারুর হুকুমের চাকর গদাবাবু ?'

'আলবাত না—' মোমের কাঁপা-কাঁপা শিখায় আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল গদা, 'আমার আর ধৈর্য নেই। শোন ছট্টু, গাড়ি রেডি রাখবি। ভোর-ভোর পৌঁছতে হবে সোনারপুরে।'

'ঠিক আছে।'

'গাবু, গাঁইতি-টাইতি রেডি ? ডজন খানেক বড় রুমাল আর দড়ি ?'

'হ্যাঁ মামা।'

'কোদালটা খুলে নিবি। ওখানে গিয়ে ফিট করে নেব—' গদা বলল, 'দোতলার ঘরে সব জড়ো করে রেখে আসব আমি। তোদের সকলকে নিয়ে পাঁচিল টপকে ঢুকব গভীর রাতে। কাজ শুরু করব রাত বারোটায়। বিষ্টি-বাদলার দিন, মাটি নরম হয়ে আছে। কাজ শেষ করতে খুব দেরি হবে না।'

জহর বলল, 'গাড়ি নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না গদাবাবু।'

'আমি বুদ্ধু নাকি ? গাড়িতে যন্ত্রপাতি পাচার করেই ফিরব ভোরবেলা। রাতের ট্রেনে সকলে যাব আবার।'

ঠিক হল কাল খুব ভোরে ওরা বেরিয়ে পড়বে। যদি কারুর চোখে পড়ে যায় আর কেউ কোনো প্রশ্ন করে তাহলে তাকে বললেই হবে যে স্কুলবাড়ির কাজে তারা এসেছে। মুনমুনরা এসে পৌঁছবার অনেক আগেই শাবল-টাবল রেখে ছট্টু গাড়ি রাখতে ফিরে আসবে কলকাতায়, অন্যরা কাছাকাছি কোনো স্টেশনে দিনটা কাটিয়ে দিয়ে অন্ধকার হওয়ার মুখে-মুখে এক-একজন আলাদা আলাদা যাবে সোনারপুরে। আর বাড়ির পেছনের ভাঙা পাঁচিল টপকে একে একে সাবধানে লাফিয়ে পড়বে ভেতরে। তারপর ভাঙা সিঁড়ি লাফিয়ে পার হয়ে দোতলায় দক্ষিণের শেষ ঘরে

লাইফবয় যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে

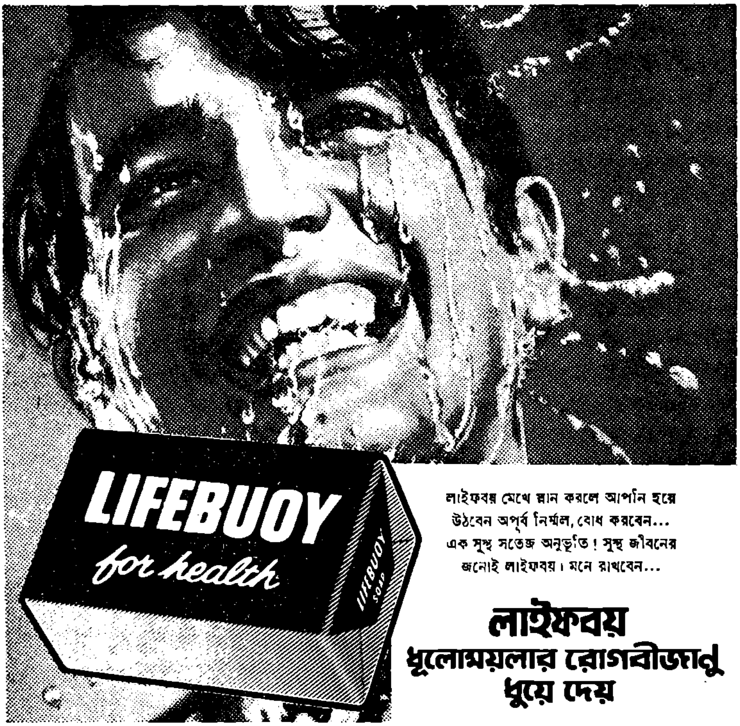

লাইফবয় মেখে স্নান করলে আপনি হয়ে
উঠবেন অপূর্ব নির্মল, বোধ করবেন...
এক সুস্থ সতেজ অনুভূতি ! সুস্থ জীবনের
জন্যেই লাইফবয়। মনে রাখবেন...

লাইফবয়
ধুলোময়লার রোগবীজানু
ধুয়ে দেয়

আর পাওয়া যায় **লাইফবয় পার্সোনাল**

সেই পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতির জন্যে

LINTAS/LP/23/203 BG

চুপচাপ বসে থাকবে মাঝরাত অবধি। যদি বৃষ্টি হয়, তাহলে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। বৃষ্টি ধরলেই শুরু হবে কাজ।

জহর বলল, 'বোমা নিতে হবে তো সকলকে ?'

'সঙ্গে থাকবে দু-চারটে। তবে ওসবের বোধহয় দরকার হবে না—' গদা বলল, 'কেউ দেখে ফেললেই তো হয়ে গেল। বোমবাজি-টাজি চললে তো আর কাজটা কমপ্লিট হবে না।'

'তা ঠিক।'

'তবে পিস্তল আমি একটা রাখব সঙ্গে।'

'ব্যস, তাহলেই হবে। আর ছোরা তো আমার পেটের সঙ্গে সেঁটেই আছে দিনরাত।'

এত পরে কথা বলল গাবু, 'মামা, কাজ ফিনিশ করে ফেরার সময় গাড়ির দরকার হবে যে। মানে, মাটির তলা থেকে যা তুলব আমরা তা লুকিয়ে বয়ে আনতে হবে তো ?'

'থাম বেটা ! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি—' গদা হেসে বলল, 'সব খেয়াল আছে রে আমার। বাড়িউলি গাড়ি নিয়ে যাবে বলল। ওদের গাড়িটা গ্যাঁড়া মারব ঠিক করেছি।'

গদার কথা শেষ হতে না-হতেই দরজায় শব্দ হল, টুক-টুক-টুক !

এত রাতে আবার কোথা থেকে কী খবর এল ! গদা ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে সকলকে ইশারায় চুপ করতে বলল। তারপর ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল মোমবাতি।

খুব সাবধানে আস্তে দরজা খুলল গদা। কিন্তু বাইরে কেউ নেই। রাস্তা একেবারে ফাঁকা। গদা এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল। কেউ নেই।

আজ রাতে সারা সোনারপুর যেন নিথর নিস্পন্দ হয়ে আছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই। কুকুর কিম্বা শেয়ালের ডাকও আজ কানে আসে না। সোনারপুরের জমিদারবাড়িতে বৈদ্যুতিক আলো এখন আর নেই। মুনমুনের বাবা শুয়ে পড়বার আগে মাথার ওপর ঝোলানো গ্যাসের বাতিটা নিভিয়ে দিয়েছে। এখন ঘরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

মুনমুন আর তার বাবা অঘোরে ঘুমোচ্ছে, কিন্তু মুনমুনের মার চোখে ঘুম নেই। একটা আতঙ্কে তার বুক থেকে থেকে থমথম করে উঠছে। তার মনে হচ্ছে, এখুনি কেউ যেন এসে দাঁড়াবে তার সামনে—তাকে ভয় দেখাবে।

রাত কত মুনমুনের মা ঠিক বুঝতে পারল না। রিস্টওয়াচ আছে টেবিলের ওপর, কিন্তু একা একা উঠে রেডিয়ম-জ্বলা ঘড়িতে সময় দেখার সাহস তার নেই। কখন ভোর হবে কে জানে। বাইরে আলো ফুটে উঠলে সে যেন বেঁচে যায়। এই রকম না ঘুমিয়ে রাত কাটানো যায় না। মুনমুনের মা ঠিক করল, আর এক রাতও এখানে নয়, কালই সকলে ফিরে যাবে কলকাতায়।

সেই নিস্তব্ধ অন্ধকারে হঠাৎ খুট করে শব্দ হল। ধক করে উঠল মুনমুনের মার বুক। যা ভেবেছিল, তাই। দরজাটা আপনা আপনি খুলে গেছে ! এখন কোন্ মূর্তি এসে দাঁড়াবে তার সামনে ? কী করবে মুনমুনের মা ? তার গলা শুকিয়ে গেছে, নিশ্বাস পড়ছে জোরে-জোরে। উঠে খোলা দরজাটা বন্ধ করে দেওয়ার সাহসও তার নেই। ঘন অন্ধকারে দরজার দিকে তাকিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকল মুনমুনের মা।

দরজা খোলাই থাকল। কিন্তু কোনো হাতকাটা রোগা লোক কিম্বা বাচ্চা কোলে নিয়ে অল্পবয়েসি বউ—কেউই এসে দাঁড়াল না সামনে। আলোর রেখাও ফুটে উঠল না।

আরও পরে মুনমুনের মা ভাবছিল এবার সাহস করে উঠে দরজাটা বন্ধ করে দেবে, আর তখনই নিস্তব্ধ গভীর রাতে তার কানে এল ঝপঝপ শব্দ। খুব দূর থেকে নয়, মনে হল শব্দ আসছে কুয়োর ধার থেকে।

কিসের শব্দ ওটা ? এত রাতে কে আসবে এ বাড়িতে ? ওই রকম শব্দ কেন উঠবে ? চুপচাপ আর শুয়ে থাকা যায় না। হঠাৎ কী

বিপদ ঘটে যায় কে জানে। এখুনি মুনমুনের বাবাকে জাগিয়ে দেওয়া দরকার।

'শুনছ, শুনছ ?'

আরও কয়েকবার হাত ঝাঁকিয়ে ডাকাডাকি করবার পর মুনমুনের বাবা ঘুমের ঘোরে বলে উঠল, 'কী হয়েছে ?'

'কুয়োর পাশে অনেকক্ষণ থেকে অদ্ভুত শব্দ হচ্ছে। আমার বড় ভয় লাগছে—'

মুনমুনের বাবাও সেই ঝপ ঝপ শব্দ শুনল। তার ঘুম ছুটে গেল। লাফিয়ে খাট থেকে নামল সে, টেবিল থেকে টর্চ তুলে নিয়ে এগিয়ে গেল খোলা দরজার দিকে।

মুনমুনের মা মশারি তুলে বেরিয়ে এসে শক্ত করে তার হাত চেপে ধরল, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

'ওই দিকে, শব্দ কে করছে দেখতে।'

'না, তোমাকে বাইরে যেতে হবে না, দরজাটা শুধু বন্ধ করে দাও।'

'কে খুলল দরজা, তুমি ?'

'না। আপনি খুলে গেছে।'

মুনমুনের বাবা হেসে বলল, 'ও, ভূতের ব্যাপার ! এ সুযোগ ছাড়ছি না, আজ আমি ভূত দেখবই—' বলতে বলতে সে পলকে চলে এল দরজার বাইরে, লম্বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে শব্দ লক্ষ করে জোরালো টর্চ ফেলল কুয়োর দক্ষিণে, 'কে ওখানে ?'

শব্দ থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ওদিকেও জ্বলে উঠল আরও জোরালো টর্চ। মুনমুনের বাবা দেখল তিন-চারজন লোক দ্রুত পা ফেলে এগিয়ে আসছে তার দিকে। রুমালে তাদের মুখ ঢাকা, মাথায় হেলমেট।

মুনমুনের বাবা কী করবে ঠিক করবার আগেই হুড়মুড় করে এসে ওরা ঘিরে ফেলল তাকে ! এক ঝাপটায় তার টর্চ কেড়ে নিল। গদা পিস্তল তুলে ভারী আর রূঢ় স্বরে বলল, 'দেখছেন আমার হাতে কী ? ভয় পাবেন না, আপনাদের কোনো ক্ষতি আমরা করব না, শুধু বাকি রাতটুকু একটু কষ্ট দেব—' জহরের দিকে ফিরে সে বলল, 'হাত বাঁধো, মুখে রুমাল চাপা দাও—'

মুনমুনের বাবা রাগে চিৎকার করে উঠল, 'কী করছ তোমরা বদমাশ ?'

'এই চোপ !' গদা তার পেটে পিস্তল ঠেকিয়ে বলল, 'আর একটি কথা বললেই ফিনিশ করে দেব।'

মুনমুন জেগে উঠে কাঁদছিল। আর তার মা ভয়ে কাঁপছিল। মুনমুনের বাবার হাত-মুখ বেঁধে তাকে ঠেলে ঘরে নিয়ে এল জহর। মুনমুন আর তার মাকেও ঠিক তেমন করেই বাঁধল। গদা এসে টেবিল থেকে ওদের গাড়ির চাবি তুলে নিয়ে পকেটে রাখল। পিস্তল উঁচিয়েই গদা দলবল নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। গাবুকে বলল, 'নে, তালা দিয়ে দে—' পরে মুনমুনের মা-বাবার দিকে দেখল, 'লাফালাফি করবেন না, কোনো লাভ হবে না, বুঝলেন ? কেউ কোথাও নেই। ঘাবড়াবেন না। কাজ শেষ করেই আপনাদের বাঁধন খুলে দেব।'

মুনমুনের বাবা কথা বলতে পারল না, হাত দিয়েও কিছু করা গেল না, শুধু মাটিতে জোরে জোরে পা ঠুকে রাগে ফুঁসে উঠল।

হো-হো করে হেসে উঠল গদা, 'বাপ রে, কী তেজ !'

ওদের ঘরে তালা লাগিয়ে এরা চারজন আবার ফিরে এল নিজেদের কাজের জায়গায়—কুয়োর দক্ষিণে বিশ পা দূরে। বৃষ্টি নেই কিন্তু আকাশ থমথমে। শেষ রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া শিরশির করে খেলে বেড়াচ্ছে।। একটা রাত-জাগা পাখি ক্যাঁ-ক্যাঁ করে ডাকতে ডাকতে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল জমিদার-বাড়ির ওপর দিয়ে। ওরা মুখ থেকে রুমাল খুলে নিল। আবার শুরু হল ঝপ ঝপ শব্দ। গদা জোরালো টর্চ জ্বেলে দাঁড়িয়ে আছে। মাটি খুঁড়ছে ছটু, গাবু আর জহর। প্রথম কাজ শুরু করেছিল গদা নিজে। ভিজে মাটি। বেশ নরম। অনেকটা জায়গা খোঁড়া হয়েছে। এপাশে-ওপাশে জমে উঠেছে ভিজে মাটির উঁচু উঁচু ঢিবি। সোঁদা গন্ধ উঠছিল।

'কই গদাবাবু ?' জহর ঝপাঝপ কোদাল চালাতে চালাতে হাসল, 'বিরাট গাড্ডা হয়ে

গেল যে, কিছু তো মিলছে না। গুপ্তধন-টন হাপিস হয়ে গেল নাকি ?'

গদা গম্ভীর হয়ে বলল, 'হাত ব্যথা করছে ? তবে আমাকে দাও কোদাল, আমি কোপাই—'

'এ লোহার হাত দুটো অত সহজে টনটন করে না গদাবাবু। হুকুম কর তো একেবারে পাতাল পর্যন্ত খুঁড়ে চলব।'

'শাবাশ ! হাত চালা রে গাবু। ছটু, চালা-চালা ! রাত থাকতে-থাকতে কাজ শেষ করতে হবে রে !'

টর্চ ঘুরিয়ে গদা একবার চারপাশ দেখে নিল। তার কান উৎকর্ণ, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। মুনমুনের মা-বাবার ঘরটার দিকে সে কিছুক্ষণ টর্চ ধরে রাখল। সাড়া-শব্দ নেই—একেবারে চুপচাপ। শুধু সেই রাতজাগা পাখিটা এক একবার ক্যাঁ-ক্যাঁ করে উঠছে। গদার ইচ্ছে করছিল কিম্ভুত পাখিটাকে গুলি করে মাটিতে ফেলে দিতে।

গাবুর গাঁইতির ঘায়ে ঠন করে একটা শব্দ উঠল। গাবু লাফিয়ে নামল গর্তের মধ্যে। ছটু আর জহর কাজ বন্ধ করে ঝুঁকে পড়ে দেখল নীচের দিকে। গদা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে টর্চ ফেলল। উত্তেজনায় ওদের সকলের বুক খুব তাড়াতাড়ি উঠছে নামছে।

'মামা !' আনন্দে চিৎকার করে উঠল গাবু। সে পেতলের একটা বেশ বড় ঘড়া দেখতে পেয়েছে। কাদায় কাদায় কালো হয়ে গেছে ঘড়াটা। আর বোধহয় সিমেন্ট দিয়ে মুখ বন্ধ করা হয়েছে, তার ওপর জমে উঠেছে পুরু কাদার তাল। গাবু পাগলার মতো আঁচড়ে-আঁচড়ে ঘড়ার মুখ খোলবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। তখন সে সেটা তুলে ওপরে নিয়ে আসবার চেষ্টা করল। তাও পারল না—ঘড়া এত ভারী।

তখন গদা তুলে আনল ঘড়া। জহর ধারালো ছোরার খোঁচায় বেশ অল্প সময়ের মধ্যে কাদামাটি সাফ করে দিল। তার শাবলের ঘায়ে ঝুরঝুর করে খসে পড়ল সিমেন্ট। গদা আর ধৈর্য ধরতে পারল না, ব্যগ্র হাত চালিয়ে দিল ঘড়ার মধ্যে। খুব ঠাণ্ডা কী যেন সে স্পর্শ করল। গদা কয়েক সেকেণ্ড পরেই দেখল তার হাতের মুঠোয় সোনার ভারী একটা হার আর কয়েকটা দুর্মূল্য চৌকো মোহর। খুশিতে তার শরীর থরথর করে উঠল, 'মার দিয়া !'

জহর গাবু আর ছটু—সকলেই গদার হাতে হার আর মোহর দেখল। দেখে গাবুকে জড়িয়ে ধরে জহর তিন পাক ঘুরে-ঘুরে নাচল। পরে গেয়ে উঠল,

'এ মেরা গাব্বু মাস্টার
তুমকো লাখো সেলাম !
হাম সব আভ্‌ভি রাজা বনগে
আউর সব গোলাম !'

গদা আদেশ করার মতো গম্ভীর স্বরে বলল, 'ব্যস্‌, ফুর্তি-টুর্তি এখানে আর একদম নয়। রাতারাতি কেটে পড়ি চল—' একটু থেমে সে শুকনো হাসল, 'আমি বেইমান নই, ডেরায় ফিরেই সমান ভাগবাটোয়ারা হবে।'

আস্তে আস্তে পা ফেলে চুপেচাপে সকলে বাইরে গাড়িবারান্দায় মুনমুনদের গাড়ির কাছে এল। চাবি ঘুরিয়ে লক্‌ খুলল গদা। জহর আর সে বসল সামনে। তাদের পায়ের কাছে থাকল সোনাদানায় ভরা সেই ভারী পেতলের ঘড়া। হাসি-হাসি মুখ করে গাড়ির পেছনের সিটে গা এলিয়ে দিল গাবু আর ছটু।

গাড়িতে স্টার্ট দিল গদা। এঞ্জিন থরথর করে উঠল। সে ক্লাচ ছাড়তে যাবে—এমন সময় বাঁশি বেজে উঠল পি-পি করে আর পরপর দুবার গুলির শব্দ হল—গুড়ুম, গুড়ুম !

ওরা হতভম্ব হয়ে দেখল, যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে মুহূর্তে ওদের গাড়ি ঘিরে ফেলেছে পুলিশ। এপাশে দুজন, ওপাশে দুজন, সামনে দুজন। প্রত্যেকে বন্দুক তুলে আছে। হয়তো গাড়ির পেছনেও এইরকম পুলিশ আছে।

কঠিন হাতে দুমদাম করে গাড়ির চারটে দরজাই খুলে ফেলল চারজন পুলিশ। একজন সুদর্শন পুলিশ অফিসার গদাকে

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ভক্ত শুধু বড়রা নয়, ছোটরাও

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু যে বড়দেরই প্রিয় লেখক তা নয়, ছোটরাও তাঁর কিশোরসাহিত্যের দারুণ ভক্ত। হবে নাই বা কেন। যেমন সুন্দর গল্প তেমনই সুন্দর ভাষা আর বর্ণনাভঙ্গি। শরদিন্দুর যাবতীয় ছোটদের লেখা নিয়ে বেরিয়েছে শরদিন্দু অমনিবাসের চতুর্থ খণ্ডটি। এই একটিমাত্র বইতেই সদাশিবের দারুণ সব কাহিনী, অজস্র গল্প আর আকর্ষণীয় অন্যান্য লেখা। আরেকটি বই হল, 'ভূমিকম্পের পটভূমি'। দুটি অ্যাডভেনচার কাহিনীর এক অনবদ্য সংকলন এই বইটি। একটি কাহিনীতে একটি নির্জন দ্বীপ আর সেখানকার বাসিন্দা বলতে ছোট্ট একটি মেয়ে ও তার ক্যাঙারু-বন্ধুর গল্প, আরেকটিতে পাঁচশো বছর আগেকার এক যুবরাজ যুবরানীর বহু জন্ম বাদে পুনর্মিলন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বই

ভূমিকম্পের পটভূমি ৫·০০
শরদিন্দু অমনিবাস ৪র্থ খণ্ড ২৫·০০

আরো অনেক বই

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকম্পের পটভূমি ৫·০০ আশা দেবীর আসল টেনিদা ১০·০০ সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের রুকুসুকু ৮·০০ ইন্দ্রমিত্রের বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৮·০০ শরৎ-কথামালা ১০·০০ দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়ের কথায় কথায় ১০·০০ সুজিতকুমার সেনগুপ্তের রহস্যময় সেই রিভলবার ৮·০০ সুনির্মল বসুর ছন্দের টুংটাং ৮·০০ বঙ্কিমচন্দ্র ৪·০০ মাইকেল মধুসূদন ৬·০০ পার্থসারথি চক্রবর্তীর কেমিক্যাল ম্যাজিক ৫·০০ চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৬·০০ রসায়নের ভেল্‌কি ৪·০০ ম্যাজিকের মত মজা ৫·০০ তত সহজ ছিল না ৫·০০ মজার এক্সপেরিমেন্ট ৫·০০ বুদ্ধি নিয়ে দারুণ মজা ৬·০০ পদার্থবিজ্ঞানের খোশখবর ৭·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

বলল, 'নাম গাড়ি থেকে।'

'কী অপরাধ করলাম স্যার?'

'শাট আপ! নাম শিগগির! পকেটে হাত দিয়েছিস কি গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব, স্কাউনড্রেল।'

চারজনকেই টেনে-টেনে নামানো হল গাড়ি থেকে, চটপট হ্যাণ্ডকাপ লাগিয়ে দেওয়া হল! ওরা দেখল গাড়ির পেছনে একা দাঁড়িয়ে আছে সেই পাগল। তার হাতে বন্দুক-টন্দুক নেই, শুধু বাঁশিটা। তার দিকে কটমট করে তাকাল গদা। তাকিয়ে মনে মনে ভাবল, তুমি যে টিকটিকি তা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। ইস! কী ভুলই যে করেছি!

সুদর্শন অফিসার কড়া স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'ওই বন্ধঘরের চাবি কার কাছে আছে?'

কেউ উত্তর দিল না। অন্য আর একজন হাঁস করে জোরে এক চড় মারল গাবুর গালে, 'বল্!'

'আমার পকেটে আছে।'

অফিসার অন্য আর একজনের হাত থেকে চাবি নিয়ে পুলিশদের বলল, 'সকলকে নিয়ে এসো আমার সঙ্গে ভেতরে।'

আর একজন অফিসার বলল, 'সকলকে নিয়ে যাবেন স্যার?'

'এদের চোখের আড়াল করতে চাই না অবিনাশ। এরা দাঁত দিয়ে হ্যাণ্ডকাপ কাটতে পারে। মোহন, পরেশ—তোমরা ঘড়াটাও নিয়ে এসো—' পাগলের দিকে তাকিয়ে অফিসার হেসে বলল, 'আসুন চন্দনবাবু, আজকের হিরো তো আপনিই।'

যে-ঘরে মুনমুন আর তার মা-বাবাকে তালা বন্ধ করে রাখা হয়েছে, সে-ঘরের তালা খুলল পুলিশ-অফিসার। কয়েকটা টর্চ একসঙ্গে জ্বলে উঠল। খাটে শুয়ে গোঁ-গোঁ করছে মুনমুন আর তার মা। মুনমুনের বাবা দাঁড়িয়ে আছে অসহায়ের মতো। দুজন পুলিশ অফিসার চটপট সকলের বাঁধন খুলে দিল। খুলতে-খুলতে একজন বলল, 'ব্রুট! ছোট মেয়েটার হাত কীভাবে বেঁধেছে দেখুন।'

মুনমুন আর তার মা কেঁদে উঠল জোরে। আর তার বাবা বিস্ময়ে যেন গুম হয়ে গেছে। সে বুঝতেই পারছে না কেমন করে কী ঘটে গেল একটু আগে আর এখন কী ঘটে যাচ্ছে। মুনমুনের বাবা বোবার মতো শুধু দেখল যে ঘরে পুলিশ, ঘরের বাইরেও পুলিশ, আর হাতকড়া লাগানো চারজন ভয়ঙ্কর লোক।

পুলিশ-অফিসার মুনমুনকে সান্ত্বনা দিয়ে মিষ্টি করে বলল, 'কেঁদো না মা, ভয় কী! আমরা তো এসে গেছি।'

মুনমুনের বাবা জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আপনারা ঠিক সময় এখানে এলেন কেমন করে?'

অফিসার হাসল। পাগলকে ডাকল ঘরের মধ্যে। তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'আমরা ঠিক সময় আসতে পেরেছি এঁর জন্যে। যদিও ঠিক এই মুহূর্তে আমরা আসিনি, এসেছি অনেক আগে—আস্তাবলে, আমবাগানে এদিক-ওদিক লুকিয়ে ছিলাম ওই চারজন নামকরা ক্রিমিন্যালকে হাতে-নাতে ধরবার জন্যে।'

আর একজন অফিসার বলল, 'ওদের সব খবরই আমরা রাখতাম, শুধু প্রমাণের অভাবে এতদিন অ্যারেস্ট করতে পারিনি। চন্দনবাবু না থাকলে আজও আমরা কিছু করতে পারতাম না, আপনাদেরও ভাগ্যে কী ঘটত বলা যায় না।'

মুনমুনের বাবা উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করল, 'চন্দনবাবু কে?'

'এই যে—' পাগলের দিকে তাকিয়ে হাসল অফিসার। 'ইনিই চন্দনবাবু—চন্দন ঘোষাল। দুঃসাহসী ইয়ং প্রাইভেট ডিটেকটিভ। ভীষণ বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন।'

পাগল হাসল। নকল দাড়ি-গোঁফ টেনে খুলে ফেলল। পরচুলও খুলল। তার আসল চেহারা দেখে গদা আর স্থির থাকতে পারল না, বলে উঠল, 'ভম্বু!'

গদার গলার স্বর শুনে চমকে উঠল মুনমুনের মা। তাকে দেখতে দেখতে এত পরে প্রথম কথা বলল, 'ভূমেনবাবু !' আর গাবুর দিকে চোখ পড়তেই সে তাকিয়ে থাকল তার দিকে ভীষণ অবাক হয়ে।

চন্দন বলল, 'ভূমেনবাবু সেজেছিল। ও আসলে গদা। কলকাতার নাম করা গুণ্ডা—' সে গদার দিকে ফিরল, 'হ্যাঁ গদাবাবু, কালা চাকর সেজে আমিই সুযোগ বুঝে ঢুকেছিলাম তোমার আস্তানায়—' একটু থেমে সে মুনমুনের মাকে বলল, 'নমস্কার মিসেস চ্যাটার্জি। আমিই পরশু আপনাকে ফোন করে বলেছিলাম এ-বাড়িতে কাউকে ঢোকার অনুমতি না দিতে।'

মুনমুনের মা কান্না-কান্না গলায় বলল, 'কিন্তু আমরা কেন জড়িয়ে পড়লাম এ-সবের মধ্যে ? কী করেছি আমরা ?'

'না-না, আপনারা কিছুই করেননি, শুধু আপনার অজ্ঞাতে আমাকে সাহায্য করেছেন এই ক্রিমিন্যালদের হাতে-নাতে ধরতে—' একটু থামল চন্দন। প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মুনমুনের মাকে আবার বলল, 'আপনার ঠাকুর্দার ছবি বাঁধাতে দিয়েছিলেন গাবুর দোকানে ?'

'হ্যাঁ।'

'একটা ছড়া লেখা ছিল ছবিটার মধ্যে—' চন্দন জোরে-জোরে ছড়ার চার লাইন আবৃত্তি করে শুনিয়ে দিল, 'গাবু ছুটে এসে গদাকে বলল গুপ্তধনের কথা। গদা ততটা গ্রাহ্য করল না প্রথমে। কিন্তু আমি আমার কর্তব্যস্থির করে নিলাম। ভাবলাম এদের মনে নেশা ধরিয়ে দিতে হবে—বুঝিয়ে দিতে হবে যে আরও কেউ জানে গুপ্তধনের খবর। তাহলে এরা খেপে উঠবে—সব কাজ বন্ধ করে দলবলসুদ্ধ এখানে আসবে গুপ্তধনের সন্ধানে, আর আমাদেরও সুবিধা হবে।'

মুনমুনের বাবা জিজ্ঞেস করল, 'তারপর ?'

'গদার বাড়ি থেকে আমি সরে পড়লাম। ডুপ্লিকেট চাবির গোছা সব সময় আমার কাছে থাকে। তখনই গাবুর দোকান থেকে চুরি

কলকাতার নতুন সিগন্যাল

কলকাতার উন্নতির জন্যে আমরা কি করেছি, করছি এ নিয়ে তোমাদের অনেক বলেছি। তোমরাও পড়েছ এবং জেনেছ। সেই সংগে নিজেদের পরিচয়ও করে নিয়েছ আশা করি। আমাদের প্রতিদিনের চিন্তাভাবনা—কাজকর্মে এই শহরের বহুসমস্যা সমাধানের চেষ্টার ছাপও আছে। হয়ত সব চেষ্টা সফল হয়নি। কিন্তু কিছু তো হয়েছে। তাই বা কম কিসে। ধর হাওড়ার সাবওয়ে, দু দুটো ফ্লাইওভার, রাস্তাঘাট অনেক চওড়া করা, একপ্রেসওয়ে তৈরী করা, কলকাতার কাছেই পূর্ব কলকাতা, কোনা, বৈষ্ণবঘাটা পাটুলী প্রভৃতি উপনগরী নির্মাণ। এসবই আমাদের সাধের কলকাতাকে বিপুল জনসমস্যা-যানজট সমস্যা থেকে কিছুটা স্বস্তি দেবার জন্যেই তো ?

বলতে বলতেই যানজট সমস্যার কথা চলে চলে এলো। তোমরা যাকে বল ট্র্যাফিক জ্যাম। বড় বড় রাস্তার মোড়ে রোজই লম্বা যানজট হচ্ছে। এ দৃশ্যের সংগে তোমাদের রোজকার পরিচয়। তাই ট্র্যাফিকের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করতে এবার আমরা এক নতুন ব্যবস্থা নিয়েছি।' এই ব্যবস্থা অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিতে বসানো হচ্ছে বিভিন্ন রকম সংকেতযুক্ত আলো। এর প্রথম পর্বের কাজ ইতিমধ্যেই বি বি ডি বাগ অঞ্চলে শেষ করে চালু করা হয়েছে। আমরা যদি সবাই অর্থাৎ গাড়ীচালক ও পথযাত্রীরা সচেতন হই তাহলে যানজট সমস্যার সুরাহা হবেই এটা হলফ করে বলতে পারি। তাই তোমাদের বলি এই আলো সংকেতগুলোর সংগে পরিচিত হও, মেনে চলো এর নিয়মগুলো এবং অন্যদেরও জানাও এ সম্বন্ধে।

এই সংকেতগুলোর সংগে পরিচয় করানোর জন্যে আমরা একটা বইও রেখেছি তোমাদের জন্যে। চিঠি লিখলেই পাবে।

(জনসংযোগ বিভাগ, সি এম ডি এ ৩-এ অকল্যান্ড প্লেস, কলিকাতা ১৭ থেকে প্রচারিত)

করলাম ছবিটা—' মুনমুনের মার দিকে তাকিয়ে চন্দন বলল, 'ফলওলা সেজে গাবুর দোকানের ফুটপাথে বসে আপনার সব কথা শুনলাম। সেইদিনই ছবিটা পৌঁছে দিলাম আপনাদের লেক ভিউ রোডের বাড়িতে।'

মুনমুনের মা বলল, 'ছবিটা পেয়ে আমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। শুধু বুঝতে পারছিলাম না কালো ফ্রেম কেন দেয়া হল। আমি তো সাদা ফ্রেমের কথা বলেছিলাম?'

চন্দন হেসে বলল, 'সে-কথাটা তো আমি শুনতে পাইনি। যাক, ওরা নেশায় মেতে উঠল। পাগল সেজে এখানে এসে আমি স্কুল খোলার কথাও শুনলাম। কিন্তু যখন-তখন এ বাড়িতে ঢোকার অনুমতি ওরা পেলে বেশ অসুবিধা হত আমাদের। আমরা ঠিক বুঝতে পারতাম না ওরা কখন কাজে নামবে। সব সময় আড়াল থেকে লক্ষ রাখা তো সম্ভব নয়। তাই আপনাকে ফোন করেছিলাম। আমি জানতাম যে বাধা পেলেই ওরা লুকিয়ে-লুকিয়ে রাত্তিরে আসবে। ভিখিরি সেজে গাবুর দোকানের দরজায় কান পেতে ওদের শলা-পরামর্শও আমি কিছু-কিছু শুনলাম। ওদের আরও খেপিয়ে দেয়ার জন্যে দোকানের দরজায় টুকটুক শব্দ করে পালিয়ে গেলাম।'

সব শুনে মুনমুনের বাবা একটু ইতস্তত করে চন্দনকে বলল, 'কিন্তু যে-জন্যে এত কাণ্ড, সেই গুপ্তধনের কী হল?'

'পাওয়া গেছে—' সুদর্শন অফিসার আঙুলের ইশারা করতেই দুজন পুলিশ সেই ঘড়াটা নিয়ে এল ঘরের ভেতর, 'এই যে। দেখুন, দেখুন! লাখ-লাখ টাকার সোনায় ভরা—'

'না-না—' মুনমুনের মা দু-হাতে চোখ ঢেকে বলে উঠল, 'আমি কিছু দেখতে চাই না। আপনারা নিয়ে যান ওটা!'

অফিসার হাসল, 'এটা যদিও সরকারের প্রাপ্য, তবে আপনার পূর্বপুরুষের সম্পত্তি তো, আপনার যদি কিছু বলবার থাকে—'

'কিছু বলবার নেই আমার।'

'আছে—' মুনমুনের বাবা আস্তে বলল, 'ছোটদের শিক্ষার ব্যাপারে আমরা খুবই উৎসাহী হয়ে উঠেছিলাম। এই টাকায় যদি এখানে সত্যি একটা স্কুল খোলা যায়—'

'আমরা সরকারকে আপনাদের অনুরোধের কথা নিশ্চয়ই জানাব—' অফিসার ঘড়ি দেখল। পরে বাইরে তাকিয়ে বলল, 'ভোর হয়ে এল। এবার আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে বিশ্রাম করুন, আমরা চলি।'

'আমরাও চলে যাব এখুনি—' মুনমুনের মা বলল, 'আর এক মুহূর্তও এখানে নয়।'

'ভয়ের আর কোনো কারণ নেই মিসেস চ্যাটার্জি। তাছাড়া আমরা দুজন পুলিশ রেখে যাচ্ছি জমিটা পাহারা দেয়ার জন্যে। আরও খুঁড়তে হবে। দেখতে হবে মাটির নীচে। আর ঘড়া-টড়া আছে কি-না।'

'আপনারা দেখুন। আমরা চলে যাব এখুনি—' মুনমুনের মা বলল, 'আর একটু পরেই লোক ভেঙে পড়বে এখানে—তার আগেই আমরা চলে যেতে চাই। আমি কাউকে কিছু বলতে পারব না আজ।'

'তাহলে আমরা আজ—' সুদর্শন অফিসার আর একজনকে বলল, 'অবিনাশ, ভ্যান আনাও!'

অবিনাশ বাইরে এসে তিনবার জোরে-জোরে হুইসেল বাজাল। অল্প পরেই গেটের সামনে এসে দাঁড়াল পুলিশের কালো গাড়ি। একে-একে গাড়িতে উঠল সকলে। কিন্তু চন্দন যে-ই উঠতে যাবে অমনি মুনমুন ছুটে এসে তার হাত ধরল, 'পাগলমামা, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে।'

মুনমুনের মা-বাবাও বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ চন্দনবাবু, আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে। ভ্যানে জায়গাও তো নেই।' পুলিশের কালো গাড়ি চলে গেল। আরও পরে যখন ভরা ধানখেত আর গাছ-গাছালির পাশ দিয়ে চন্দনকে নিয়ে মুনমুনদের গাড়ি হু-হু করে কলকাতার দিকে ছুটে যাচ্ছিল তখন সোনার রোদ্দুরে সারা সোনারপুর ঝলমল করছে।

ছবি: দেবাশিস দেব

ধাঁধা

বইমেলা থেকে একগাদা বই কিনে এনেছে ছোট্‌কা। বসে-বসে তারই পাতা ওলটাচ্ছে।

আমি যে ঘরে ঢুকেছি সেটা অবশ্য ঠিক টের পেয়েছে। চোখের ইশারায় বসতে বলল। আমি বসলাম। শুধু-শুধু বসে থাকব কেন, হাতের সামনে যে-বইটা ছিল, সে-বইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলাম। কিন্তু মন বসাতে পারলাম না। মনে হচ্ছে, জটিল কোনো অঙ্কের বই। কী সব কঠিন কঠিন গ্রাফ আর অঙ্ক রে বাবা!

হাতের বইটা পাশে রেখে ছোট্‌কা বলল, "সতু, চল, রবিবার বইমেলাটা ঘুরে আসবি। আমার অবশ্য চার দিন হয়ে গেল। কিন্তু এত বড় মেলা এবার, আরও বেশ কদিন যাওয়া দরকার।"

ছোট্‌কার সঙ্গে বইমেলায় যাওয়াটা যেমন আনন্দের, তেমনি লাভের। খাও-দাও, আর বই পছন্দ করে কেনো। ছোট্‌কা একেবারে উদারহস্ত। আমি বললাম, "কখন যাবে ছোট্‌কা? দুপুরে?"

"দুপুর-দুপুরই ভাল।" ছোট্‌কা বলল। হাতের বইটা আবার তুলে নিতে যাচ্ছিল ছোট্‌কা। কী ভেবে হাতটা নামিয়ে রাখল। বলল, "আজ অবশ্য একটা মজা হয়েছে। আমার বন্ধু অরুণকে মনে আছে তোর? সেই অরুণের সঙ্গে দেখা। সঙ্গে ছিল ছোট ভাই বরুণ। বরুণ এখন চেহারায় প্রায় অরুণেরই কাছাকাছি। বইমেলার স্টলে বরুণকেই আমি ভুল করে অরুণ ভেবেছিলাম। পরে দেখি অরুণ ভেতরে। প্রচুর আড্ডা হল। আর সেই ফাঁকে একটা ধাঁধা পেয়ে গেলাম।"

ধাঁধার কথায় আমি এক ছুটে কাগজ-কলম নিয়ে আসি। ছোট্‌কার বলা সেই ধাঁধাটা দিয়েই এবার শুরু করছি।

প্রথম ধাঁধা ।। অরুণ-বরুণ দুই ভাই। এখন বরুণের যা বয়স, অরুণ যখন সেই বয়সের, তখন বরুণের যা বয়স ছিল, অরুণের এখনকার বয়স তার দ্বিগুণ। ওদের দুজনের এখনকার বয়স যোগ করলে হয় ৪৯।

এখন অরুণের বয়স কত? বরুণেরই বা কত?

দ্বিতীয় ধাঁধা ।। একটা ইলেকট্রিক ট্রেন উত্তর দিকে ছুটে চলেছে ঘণ্টায় একশো কি. মি. বেগে। পুব দিক থেকে তখন বাতাস বইছে, ঘণ্টায় তিরিশ কি. মি. বেগে।

বলতে পারো, এঞ্জিনের ধোঁয়ার গতি কোন্ দিকে হবে?

তৃতীয় ধাঁধা ।। জট ছাড়াও—

ক র্দ ম ন র

গতবারের উত্তর ।। (১) ৫৮। (২) স্তি (নাস্তিক)। (৩) মধুমক্ষিকা।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

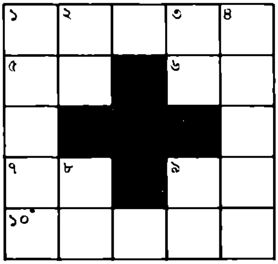

সংকেত : পাশাপাশি : (১) মহাভারতের এক মহাবীর। (৫) বিচলন বা বিহ্বলতা। (৬) গাছ। (৭) উলটে নিলেই কুলো। (৯) উলটে আছেন শিল্পকার। (১০) একই জিনিসের ভিন্ন রকম।

উপর-নীচ : (১) বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের একজন। (২) কারো কারো গালে খায়, পড়ুয়া পড়তে যায়— কী ও কোথায়? (৩) সর্পমাতা। (৪) যে বা যা চমক লাগায়। (৮) শিশু-প্রজাপতি। (৯) শীর্ষাসনে শেয়াল।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

বুক	দু	রু	দু	রু
মেঘ	গু	রু	গু	রু
নদী	কু	লু	কু	লু
চোখ	ঢু	লু	ঢু	লু

মজার খেলা

এমন একটা মজার খেলা আমরা আগে শিখেছি। এবার যেটা শিখব, সেটা সেইরকমই অনেকটা, কিন্তু বেশি কঠিন ; আর তাই বেশি মজার।

নীচের ত্রিভুজের মতো একটা ত্রিভুজ আঁকো সাদা কাগজের ওপর—

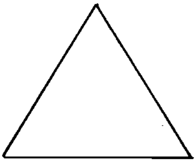

এবার কোনো বন্ধুকে বলো, ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো এমনভাবে এই ত্রিভুজের তিন বাহুতে বসাতে হবে যে, প্রত্যেক বাহুতেই যোগফল হবে ২০।

বন্ধুরা চেষ্টা করুক। অনেকেই পারবে না। আবার কেউ কেউ হয়তো পেরে যাবে। তবে যে পারবে, তারও বিস্তর সময় লাগবে।

কিন্তু নিজেকে তো তৈরি থাকতে হবে, উত্তর করে দেখাবার জন্য। আমি দুটো সমাধান শিখিয়ে দিচ্ছি। এটা শুধু তাদেরই জন্যে, যারা নিজেরা আগে চেষ্টা করে ব্যর্থ হবে।

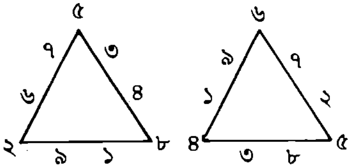

মজারু

কিসের ফোটো

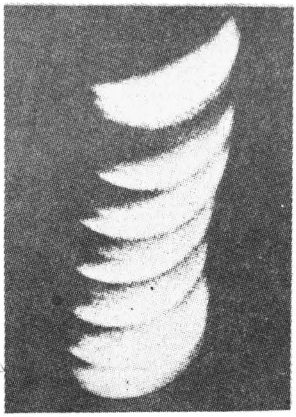

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল টর্চের ফোটো

ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ সবচাইতে সুন্দর ফুল কোনটি ?
উঃ বিউটিফুল।

প্রঃ যুদ্ধে রামের প্রধান অস্ত্র কী ছিল ?
উঃ রাম-দা।

প্রঃ আমাদের বাড়ির ডাক্তার ভাড়াটে কিছুতেই উঠছে না, কী করে ওঠানো যায় বলুন তো ?

উঃ এক ঝুড়ি আপেল পাঠিয়ে দিন ডাক্তারের বাসায়।

প্রঃ সেমিফাইনালে বেশ ভালভাবে জিতে হকিতে ফাইনালে বারবার হেরে যাচ্ছে, আর চ্যামপিয়নশিপ প্রাইজটা ফসকে যাচ্ছে। এর কী উপায় করা যায় বলুন তো ?

উঃ সেমিফাইনালটা শেষ দিনে খেলালেই হয়।

সুসেন

হাসিখুশি

বাংলা ব্যাকরণের ক্লাসে মাস্টারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, "চোরটি গত রাত্রে একটি বাড়িতে চুরি করেছে—এর মধ্যে কর্ম কোনটি বলো তো টুকুন ?"

টুকুন চটপট উত্তর দিল, "এর পুরোটাই কুকর্ম স্যার।"

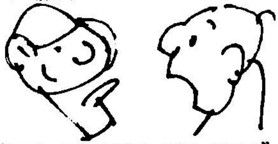

"বলো তো, অব্যয় কাকে বলে ?"

"যাকে ব্যয় করা যায় না, তাকে অব্যয় বলে, স্যার।"

ছেলের বিয়ের জন্যে মেয়ে দেখতে গিয়ে ছেলের বাবা বললেন, "মায়ের আমার কী সুন্দর দিঘল চেহারা !"

মেয়ের বাবা ব্যস্ত হয়ে বললেন, "না, না। ওকে এখন কী আর লম্বা দেখছেন। ছেলেবেলায় ও এর চেয়ে অন্তত পাঁচ গুণ লম্বা ছিল।"

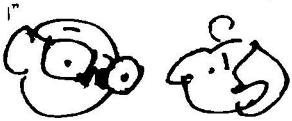

গৃহশিক্ষক বাড়িতে পড়াতে এসে নন্তুকে বললেন, "অঙ্কে তুমি এত কাঁচা কেন ? তোমাকে এত করে বোঝাই, তবু পরীক্ষায় কেন তুমি শূন্য পাও ?"

নন্তু কাঁদো-কাঁদো মুখে জবাব দিল, "সে তো আপনার জন্যেই স্যার। আপনিই তো বলেন যখন ঘুম পাবে, তখন অঙ্ক করবে। তাই সব সময় ঘুম-ঘুম চোখে অঙ্ক করি, কিচ্ছু বুঝতে পারি না।"

ছবি অহিভূষণ মালিক

ক্যাপ্টেন কপিল ফোটো : কমল সহায় (পাতা ওলটালেই ক্রিকেটের খবর)

ক্যাপ্টেন কপিল

মণি শর্মা

পাকিস্তানের কাছে সিরিজে হেরে যাওয়ার পরেও অনেকে আশা করেছিলেন, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে গাভাসকরই আবার দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হবেন। কিন্তু দলনায়কত্বের গুরুদায়িত্ব পেলেন কপিলদেব। কপিলদেবের মতো একজন চমৎকার অল-রাউণ্ডার অধিনায়ক হওয়ার ফলে ভারতীয় ক্রিকেটে বৈচিত্র্য আসার সুযোগ রয়েছে। আমাদের ধারণা, সে সুযোগ ব্যবহার করতে কপিল কখনও দ্বিধা করবেন না।

হরিয়ানার এই চব্বিশ বছরের যুবকটি ছেলেবেলা থেকে সাহসী এবং দামাল প্রকৃতির। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে পেস বোলারদের ভয়ে তিনি স্বভাব বদলাবেন না, এটা নিশ্চিত।

আটাত্তর সালে, পাকিস্তানের ফৈজলাবাদে, কপিলদেব নিখাঞ্জের টেস্টজীবন শুরু হয়। সেদিন থেকেই ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন এক অধ্যায়ের সূত্রপাত। পাকিস্তানেই কপিলদেব প্রমাণ করেছেন, তিনি চমৎকার একজন অল-রাউণ্ডার। সুইং এবং কাটারে সিদ্ধহস্ত, ব্যাটিংয়েও কমতি নন। দুরন্ত ফিল্ডিংও করতে পারেন। তাই খুব তাড়াতাড়ি ভারতীয় দলে অপরিহার্য হয়ে উঠলেন কপিলদেব।

কপিল অল-রাউণ্ডার। ব্যাট ঘোরানোর কাজেও তিনি কিছু সাফল্য অর্জন করেছেন। পঁচিশতম টেস্টের মাথায় দেখা গেল প্রতিভাময় এই অসাধারণ ক্রিকেটারের সংগ্রহের ঝুলিতে জমা পড়েছে শতাধিক উইকেট এবং সহস্রাধিক রান। অর্থাৎ

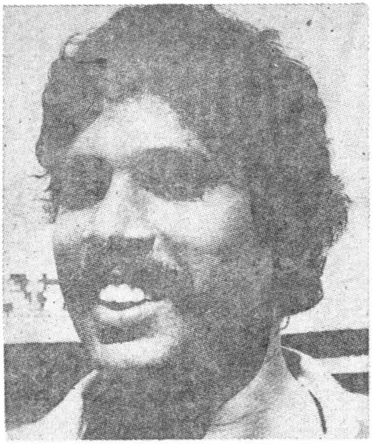

অল-রাউণ্ডার ক্যাপ্টেন

'ডাবল'। তখন তাঁর বয়স মাত্র একুশ। এত অল্প বয়সে আর কেউ 'ডাবল' করতে পারেননি।

আটচল্লিশটি টেস্টে কপিল ১৮৫টি উইকেট দখল করেছেন। অর্থাৎ, আর মাত্র পনেরোটি উইকেট পেলেই তিনি দুশো উইকেট সংগ্রহের সীমা পেরিয়ে যাবেন। এছাড়া, জানো নিশ্চয়ই, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভারতের অধিনায়ক প্রথম রানটি করামাত্র তাঁর ব্যক্তিগত রান দু-হাজারে পৌঁছে যাবে। সুতরাং, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর কপিলের জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। দুশো উইকেট আর দু-হাজার রানে ভর্তি ঝুলি, পৃথিবীতে কম ক্রিকেটারেরই আছে।

টেস্ট ক্রিকেটে কপিলের অভিজ্ঞতা কম নয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে সেই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে দুরন্ত অল-রাউণ্ডার কপিলদেব নিজেকে ভাল ক্যাপ্টেন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন বলে আমরা আশা রাখছি।

কপিল নিশ্চয়ই আমাদের হতাশ করবেন না।

এবারে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

মণীশ মৌলিক

১৯৭৮ সালে বিষেন সিং বেদীর অধিনায়কত্বে হরিয়ানার এক দামাল ছেলে পাকিস্তান সফরে গিয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স খুবই কম। জোরে বল করেন। সুইং করাতে পারেন চমৎকার। মাঝে মাঝে কাটার দিয়ে ব্যাটসম্যানকে বিভ্রান্ত করায় সিদ্ধহস্ত। ব্যাটেও হাতযশ মন্দ নয়। ঝড়ের গতিতে রান করায় বিশ্বাসী। হাতের ব্যাট তো মারার জন্যই, এই কথা যিনি সর্বদা ভাবেন, তাঁর পক্ষে ক্রিজে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা শক্ত। কপিলদেব নিখাঞ্জও তা পারেন না। তাই, ব্যাট হাতে তিনি মাঠে এলেই, স্কোরবোর্ডে ঝড় ওঠে।

অতি দ্রুত সারা পৃথিবীর মন জয় করলেন কপিল। পৃথিবীর প্রথম সারির অল-রাউণ্ডারদের একজন হলেন। দেশ-বিদেশ তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। শুধু টেস্ট খেলা ছিল কপিলদেবের স্বপ্ন। কিন্তু ক্রিকেট তাঁকে আরও অনেক কিছু দিল। ৮২-৮৩ মরসুমে, পাকিস্তান সফরে, তিনি ভারতের সহ-অধিনায়ক হলেন। আর তিরাশিতে পেলেন ভারতের অধিনায়ক হওয়ার দুর্লভ সম্মান।

ক্যাপটেন কপিলের দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজে গিয়ে বাঘা পেসারদের পাল্লায় পড়বে। তাই এবারে দল তৈরি করা হয়েছে, বিশেষভাবে। সতেরোজনের সফরকারী দলে রয়েছেন আটজন বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান। গাভাসকর যাবেন এক নম্বরে। তাঁর সঙ্গী হিসেবে দু'জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এক, বাংলার অরুণলাল এবং দুই, বরোদার অংশুমান গায়কোয়াড়। অরুণলালের ধৈর্য এবং মানসিকতা চমৎকার। তাছাড়া ব্যাটিং টেকনিক বেশ উঁচু মানের বলে তাঁকে দলে নেওয়া হয়েছে। গত দু'তিন মরসুমে চশমাধারী গায়কোয়াড় দেশীয় ক্রিকেটে ঝুড়ি ঝুড়ি রান করেছেন। গত মরসুমে তাঁর গড় ছিল চোখ ধাঁধিয়ে দেবার মতো। অথচ ইংল্যাণ্ড ও পাকিস্তান সফরে তাঁকে উপেক্ষা করা হয়েছে। পেস বোলিংয়ের বিরুদ্ধে অংশুমান বরাবরই ভাল খেলেন, এটাও তাঁকে নির্বাচন করার পক্ষে একটা মস্ত যুক্তি।

তিন নম্বর জায়গা নিয়ে চিন্তার কোনো কারণ নেই। ওটা নিশ্চিতভাবে মহিন্দর অমরনাথের জিম্মায়।

তার পরের জায়গা দীর্ঘদিন যাবৎ যাঁর জন্য বিমা করা ছিল, এবার তিনি দল থেকে বাদ পড়েছেন। বিশ্বনাথ নন, এবার ওই জায়গায় অন্য কেউ যাবেন। হয় যশপাল শর্মা, নয় 'উত্তরাঞ্চলের বিশ্বনাথ' অশোক মালহোত্রা। কে যাবেন, এই মুহূর্তে জোর দিয়ে বলা শক্ত। এর পরে বেংসরকর আসবেন। পাকিস্তানে দু-দুবার সেঞ্চুরির কাছাকাছি গিয়েও তাঁর ইচ্ছেপূরণ হয়নি। আমরা চাই, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে তিনি সেঞ্চুরি করুন। দিল্লির তরুণ ব্যাটসম্যান গুরুশরণ সিংকে টেস্টে জায়গা পেতে হলে অন্যান্য খেলায় খুব ভাল রান করতে হবে।

সৈয়দ কিরমানি এই সফরে সহ-অধিনায়ক হয়েছেন। কর্ণাটকের এই প্রতিভাবান ক্রিকেটার এখন নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উইকেটকিপার। কখনও কখনও তাঁকে বিশ্রাম দেবার প্রয়োজনে বরোদার কিরণ মোরেকে দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক হিসাবে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

গতির আক্রমণে ভারতের অধিনায়ককে সহযোগিতা দেবেন মদনলাল। সেই পরিচিত জুটি। পাকিস্তান সফরের

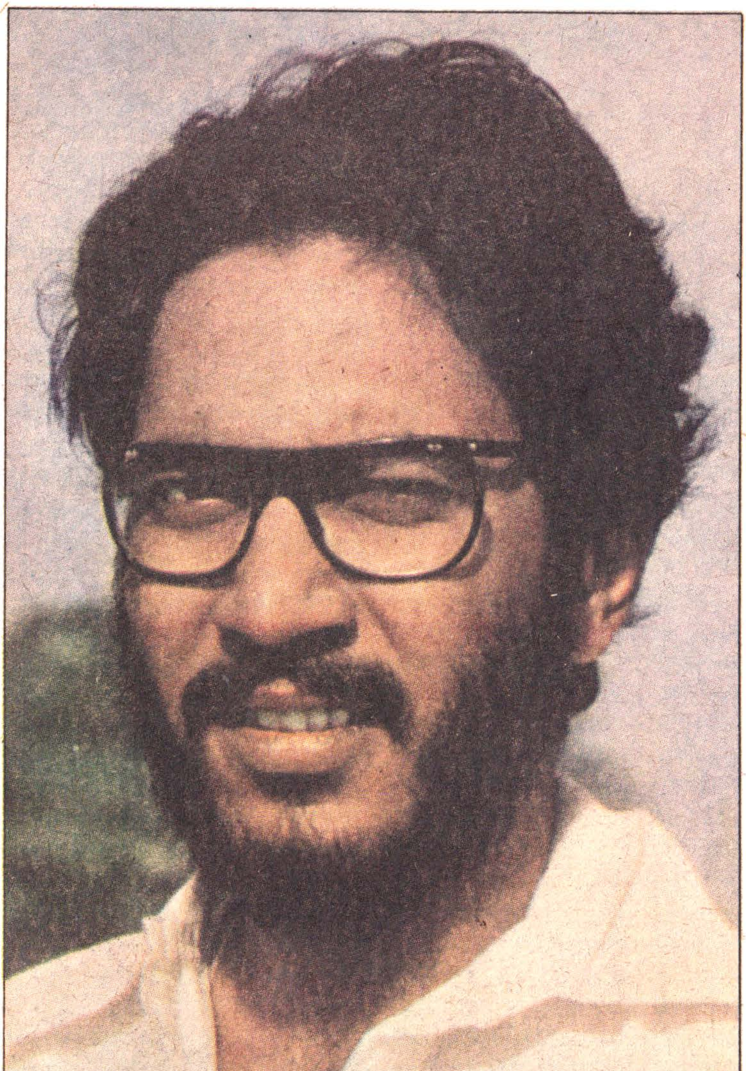

অংশুমান গায়কোয়াড় ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

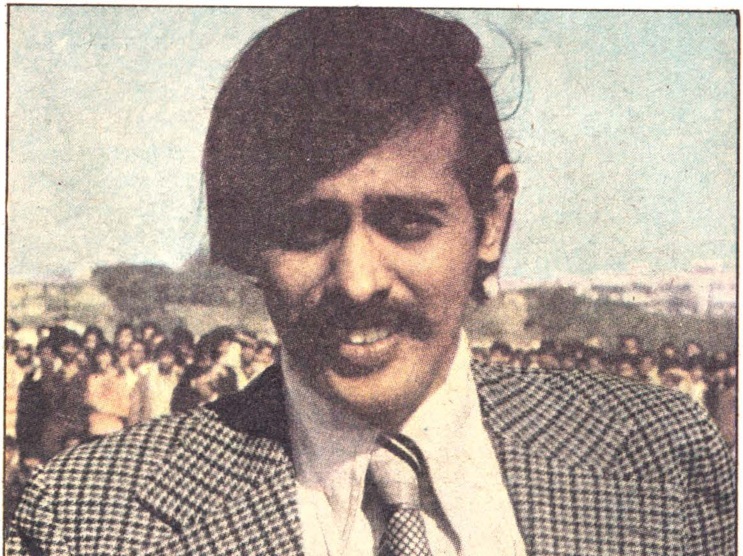

বেঙ্কটরাঘবন ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

গুরশরণ সিং

পরিপ্রেক্ষিতে বদলি বোলার হিসেবে সাঁধু দলে এসেছেন। সঠিক নির্বাচন। কারণ, সাঁধু শুধু ভাল বলই করেন না, দলের প্রয়োজনে ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাট করে বেশ কিছু রান করতে পারেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটসম্যানেরা ভারতীয় অফস্পিনারদের ভাল খেলতে পারেন না বললে ভুল হবে, তবে অফস্পিনে ওঁদের একটু দুর্বলতা আছে। সেজন্য অভিজ্ঞ বেংকটকে ফের দলে আনা হয়েছে। প্রাক্তন অধিনায়ক বেংকটের ঝুলিতে আছে ১৪৫টি উইকেট। তাঁর দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা এই সিরিজে ভারতের বিরাট শক্তি হয়ে দাঁড়াবে বলে আশা করা যায়। সঙ্গে আছেন মনিন্দর সিং। যাঁর মধ্যে ভবিষ্যতে একজন বড় স্পিনার হয়ে ওঠার সম্ভাবনা প্রবল। বেংকটের প্রধান সহযোগী তিনিই হবেন। আরও রইলেন রবি শাস্ত্রী। প্রয়োজনে তাঁকে ব্যবহার করা যাবে। লেগ স্পিনার শিবরামকৃষ্ণন পাকিস্তান সফরে টেস্টে সুযোগ পাননি। বেদী কিন্তু এই সতেরো বছর বয়সী ক্রিকেটারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

ব্রাডম্যান আউট

দিলীপ দত্ত

ডন ব্রাডম্যান সর্বকালের পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান। সুবিখ্যাত অল-রাউণ্ডার উইলফ্রেড রোড্‌স, তাঁর ক্রিকেট জীবনে, ডাবলিউ. জি. গ্রেস, ভিক্টর ট্রাম্পার, জ্যাক হবস, ওয়ালি হ্যামণ্ড, ফ্রাঙ্ক উলি এবং ব্রাডম্যানের বিপক্ষেও বল করেছেন। স্বনামধন্য ক্রিকেট-লেখক নেভিল কার্ডাস একবার রোড্‌সকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—যাঁদের বিরুদ্ধে তিনি বল করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? রোড্‌স একবাক্যে উত্তর দিয়েছিলেন, ডন ব্রাডম্যান।

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ব্রাডম্যানের গড় ৯৫·১, এবং টেস্ট ক্রিকেটে ৯৯·৯। ব্যাটিংয়ে এরকম ধারাবাহিক সাফল্য আর কারও নেই। টেস্ট ক্রিকেটে তিনি ২৯টি সেঞ্চুরি করেছেন ৮০টি ইনিংস খেলে। অন্য অনেক ক্রিকেটার তাঁর চেয়ে অনেক বেশি ইনিংস খেলেও এখনও পর্যন্ত সে রেকর্ড ভাঙতে পারেননি।

ব্রাডম্যান তাঁর ক্রিকেট-জীবনে কী কী ভাবে আউট হয়েছিলেন—জানার মতো একটি বিষয়। সর্বশ্রেণীর খেলায় তিনি ৬৬৯টি ইনিংস খেলেছেন। আউট হয়েছেন এইভাবে—কট ৩৪০, বোল্ড ১৪৮, নট আউট ১০৭, এল বি ডাবলিউ ৩৭, স্টাম্পড ২২, রান আউট ১৪, এবং হিট উইকেট ১ বার।

টেস্ট ও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ৩৩৪টি ইনিংসের হিসেব :

ফিল্ডসম্যানের ধরা ক্যাচে ১২১, বোল্ড আউট ৭৮, উইকেটরক্ষকের ধরা ক্যাচে ৪০, এল বি ডাবলিউ ২৭, কট অ্যাণ্ড বোল্ড ১২, স্টাম্পড ১২, রান আউট ৪, হিট উইকেট ১, নট আউট ৪৩। মোট আউট

হয়েছেন ৩৩৮ বার।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ব্রাডম্যান হিট উইকেট হয়েছিলেন ভারতীয় অধিনায়ক লালা অমরনাথের বলে, ১৯৪৭-৪৮ সালে ব্রিসবেনে অনুষ্ঠিত প্রথম টেস্টে। ১৯৪৭-৪৮ সালে ভারতীয় দলের অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় ব্রাডম্যান ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ১০টি ইনিংস খেলে রান করেছিলেন ১০৮১।

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া : ভারত

কট সারভাতে ব মানকড় ১৫৬, স্টাম্পড পি সেন ব মানকড় ১২।

অস্ট্রেলিয়া একাদশ : ভারত

ক অমরনাথ ব হাজারে ১৭২, কট সারভাতে ব মানকড় ২৬।

অস্ট্রেলিয়া : ভারত

প্রথম টেস্ট—হিট উইকেট অমরনাথ ১৮৫। দ্বিতীয় টেস্ট—ব হাজারে ১৩। তৃতীয় টেস্ট—এল বি ডাবলিউ ফাদকার ১৩২, নট আউট ১২৭। চতুর্থ টেস্ট—ব হাজারে ২০১। পঞ্চম টেস্ট—৫৭ রান করে আহত হয়ে আর খেলেননি।

দশটি ইনিংসে ব্রাডম্যান আউট হয়েছিলেন ৮ বার। মানকড় ও হাজারে ৩ বার করে তাঁর উইকেট পেয়েছেন এবং অমরনাথ ও ফাদকর একবার করে।

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ব্রাডম্যানের উইকেট সবচেয়ে বেশি পেয়েছেন ইংল্যাণ্ডের বাঁ-হাতি স্পিন বোলার হেডলে ভেরিটি এবং অস্ট্রেলিয়ার ডান-হাতি লেগব্রেক ও গুগলি বোলার গ্রিমেট দশ বার করে। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত ফাস্ট বোলার হ্যারল্ড লারউড, এবং ইংল্যাণ্ডের দুই মিডিয়াম পেস বোলার মরিস টেট এবং অ্যালেক বেডসার ৭ বার করে তাঁর উইকেট দখল করেছেন। ভেরিটি ও লারউড সবচেয়ে বেশি বার তাঁকে বোল্ড আউট করেছেন—৩ বার করে।

ব্রাডম্যানের ক্যাচ ধরেছেন সবচেয়ে বেশি ইংল্যাণ্ডের উইকেটরক্ষক লেসলি

ডন ব্রাডম্যান (জীবন্ত কিংবদন্তি)

এমস—৭ বার। তারপর ইংল্যাণ্ডের আর এক উইকেটরক্ষক জর্জ ডাকওয়ার্থ, অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক ডন ট্যালন এবং ইংল্যাণ্ডের লেন হাটন ৫ বার করে তাঁর ক্যাচ ধরেছেন। এখানে উল্লেখযোগ্য, হাটন ৫টি ক্যাচের মধ্যে ৪টি ক্যাচই ধরেছিলেন বেডসারের বলে একই জায়গায় ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগে দাঁড়িয়ে।

প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ব্রাডম্যান শূন্য রানে আউট হয়েছেন ১৫ বার। ব্রাডম্যান তাঁর শেষ টেস্ট ইনিংসে হোলিসের বলে বোল্ড আউট হয়েছিলেন শূন্য রানে।

ব্রাডম্যান শেষবার ব্যাট হাতে নেমেছিলেন এক প্রদ[illegible] খেলায়। সে খেলায় ৪ রান করার পরে তিনি বোল্ড আউট হন। এই ৪টি রান যদি তিনি তাঁর শেষ টেস্ট ইনিংসে করতে পারতেন তাহলে ব্রাডম্যানের টেস্টের গড় দাঁড়াত ১০০।

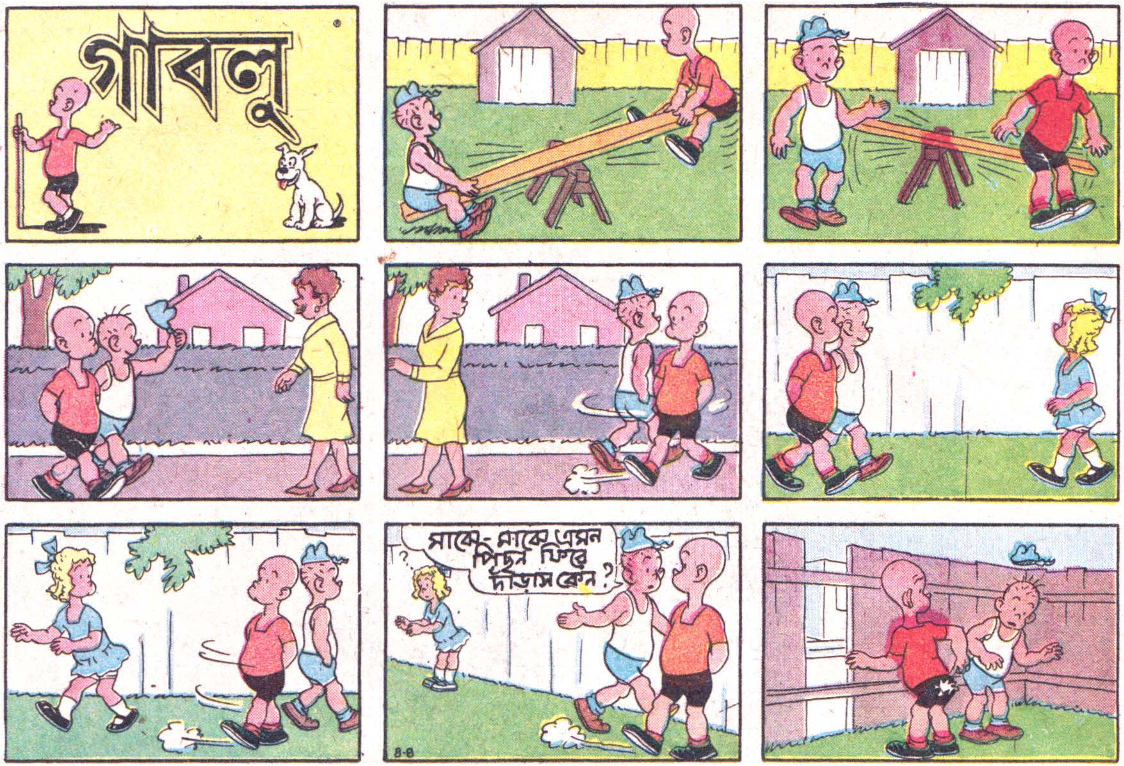
গাবলু
মাঝে-মাঝে এমন পিছন ফিরে দাঁড়াস কেন?
?

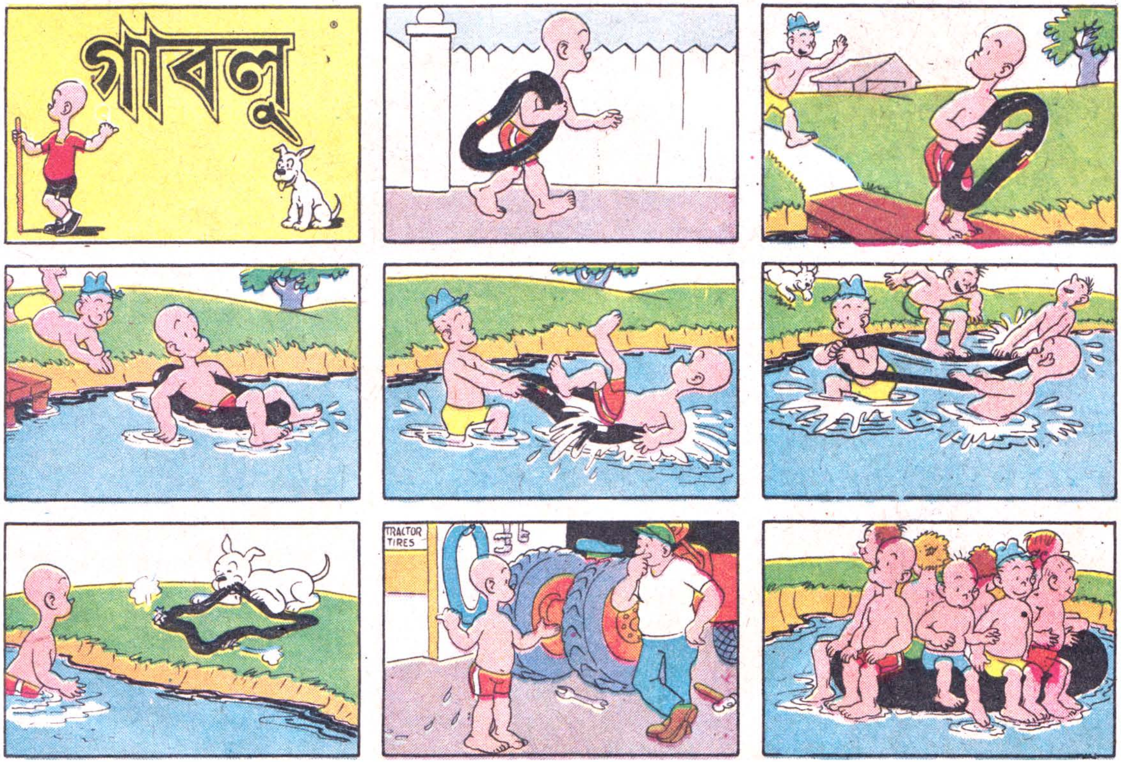
গাবলু
TRACTOR TIRES

ভূতেদের চন্দ্রবিন্দু-প্রীতি

বাচস্পতি

হিগিনকাকু একটু হেসে বললেন, " 'ভূতেদের পাড়ায় যাব' মানে বুঝিসনি ? দ্যাখো কাণ্ড ! বোস্ বোস্ । আসলে আমরা 'নাকি স্বর' অর্থাৎ আনুনাসিক স্বরধ্বনি নিয়ে কথা বলব এখন !"

ও হরি ! এই নাকি ভূতেদের পাড়ায় যাওয়া ! ভণ্টু দমে গিয়ে বসে পড়ল । কিন্তু হিগিনকাকু একটা ভূতের গল্প বলতে শুরু করে ওর দুঃখ ভুলিয়ে দিলেন খানিকটা । তারপর হাত-পা নেড়ে যেই বলেছেন "ওঁরে যাঁসনি, যাঁসনি । আঁমাকে কঁটা মাছ দিঁয়ে যাঁ—নইঁলেঁ তোঁর ঘাঁড় মটকেঁ রঁক্ত খাঁবঁ—" তখন ভণ্টু তো প্রায় শিউরে লাফিয়ে ওঠে । এইখানেই হঠাৎ গল্প বন্ধ করলেন হিগিনকাকু । বললেন, "ধরো তুমি ভূত নও ।" তারপর নিজেই হেসে ফেললেন—"দুত্তোর, ধরবি আবার কী, তুই ভূত তো নোসই । কীভাবে ভূতের ঐ কথাটা তুই বলবি দ্যাখা তো !"

ভণ্টু "ওরে যাসনি যাসনি" করে স্বাভাবিক মানুষের গলায় কথাটা বলে গেল । তারপর বুদ্ধিমানের মতো বলল, "ভূতের কথায় শুধু চন্দ্রবিন্দু আর চন্দ্রবিন্দু !"

হিগিনকাকু বললেন, "শুধু ভূতেদের কথায় কেন হবে ? আমাদেরও অনেক শব্দ আছে যাতে আমরা চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করি । অর্থাৎ সেগুলোতে একটা স্বরধ্বনি বা ভাওয়েল আছে যাকে বাংলায় বলে আনুনাসিক । ইংরেজিতে নেজাল । সোজা কথায় সেটা 'নাকি' স্বর । যেমন আঁচল, চাঁদ, পাঁচ (সব কটাতেই আনুনাসিক আ) : ইঁট, পিঁড়ি (আনুনাসিক ই) ; শুঁতো, হুঁশ (আনুনাসিক উ) ইত্যাদি ।"

ভণ্টু দুহাতে নাকের ফুটো টিপে ধরে কথাগুলো বলবার চেষ্টা করছিল । হিগিনকাকু বারণ করলেন, "আরে নাক টিপে নয়, নস্যি দিয়ে নাকের ফুটো বন্ধ করেও নয়, নাক খুলেই আনুনাসিক স্বর উচ্চারণ করতে হয় । এখানেই হল তফাত । মুখের স্বর বা ওরাল ভাওয়েল উচ্চারণে বাতাসটা বেরুবে শুধু মুখ দিয়ে ; আর নাকের স্বর উচ্চারণে মুখ আর নাক দুটো রাস্তা দিয়েই বাতাস বেরুবে । শোন্, আলজিভের পেছনদিকে হল নাকের ফুটোর রাস্তা । নাকের স্বর উচ্চারণ করবে তো ? ঠিক হ্যায়, আলজিভটা হালকা করে নামিয়ে দাও ; ব্যস, নাকের ফুটোর রাস্তা খুলে গেল । এবার উচ্চারণ করো অঁ, আঁ, ইঁ, উঁ, অ্যাঁ, এঁ, ওঁ ।"

ভণ্টু বলল, "আমি কেন উচ্চারণ করতে যাব ? আমি তো পারিই । আমার ও আলজিভ নামানোর দরকার নেই ।"

হিগিনকাকু বললেন, "কিন্তু আমরা বাঙালরা পারি না জানিস তো ? বলি 'আচল' (আঁচল), 'চাদ' (চাঁদ), 'পাচ' (পাঁচ), 'পিরি' (পিঁড়ি) । আমাদেরই ঝামেলা ।"

"তা তোমরা কী করবে এখন ?"

"আমরা ?" হিগিনকাকু ঘুষি তুলে বললেন, "আমরা নীচের জোড়া-জোড়া কথাগুলো তোর কাছে শুনে প্র্যাকটিস করব—বাস-বাঁশ, আঁক-আখ, খাটি-খাঁটি, বাধা-বাঁধা, চাদের-চাঁদের, পাটা-পাঁঠা, কাটা-কাঁটা । তুই আমাদের শিখিয়ে দিবি, কেমন ?" (ক্রমশ)

সেদিন সন্ধ্যায়

প্রসাদ

আজ চামেলিদের ইস্কুলে মেয়েদের নাচগান। বাবা-মা এসে সামনের দিকের সারিতে চেয়ারে বসে গেছেন। এমন কী, চম্বলও হাজির,

বাবা ইস্কুলের কাউকে বিশেষ চেনেন না, মা অনেককে চেনেন।

"That lady who received us at the gate was Mrs. Mittal," Mummy said to Daddy.

"A teacher?" Daddy asked.

"Yes. She teaches geography in Milly's class."

Daddy nodded.

After a time he looked about him and said, "Where's the Headmistress?"

"I don't find her here," Mummy said. "Must be behind the stage, seeing to the last minute preparations."

"I do hope they start the show on time. By the way, who was that girl who showed us to our seats? I seemed to know her face."

"Oh, don't you remember her? That was Lakshmi, Milly's classmate. She brought her to our house once."

"Really?" Daddy said, "Nice manners."

The show did start on time. Daddy looked at his watch and seemed happy.

After a couple of items, Miss Chameli Roy, the budding artiste, came on stage along with about a dozen of her fellow artistes, all dressed in gorgeous colours.

Milly was third from the left in the front row.

The girls who were standing in the back row were a little taller.

All the girls were in good voice and they were singing with spirit.

"They do sing well, don't they?" Daddy said with evident pleasure.

"Naturally," Mummy said, "Only those girls who can sing are chosen."

They were talking in whispers.

But when Chambal spoke, his whisper was a little louder than it ought to have been.

He said, "Can Milly see us, Daddy?"

"I don't think so. But not so loud, Chambal."

মিলিদের গান শেষ হয়ে গেল।

There was a short intermission.

The lights in the auditorium went up.

Those who wanted to go out for a few minutes could do so now.

For want of anything better to do Chambal started looking around.

Suddenly he saw a boy who was sitting just across the gangway smiling at him.

Rajat Kothari, his oldest and best friend!

লক্ষ করো :

The lady who received us was Mrs. Mittal.

The girls who were standing in the back row were taller.

Those who wanted to go out could do so.

He saw a boy who was sitting across the gangway.

Who was that girl who showed us to our seats?

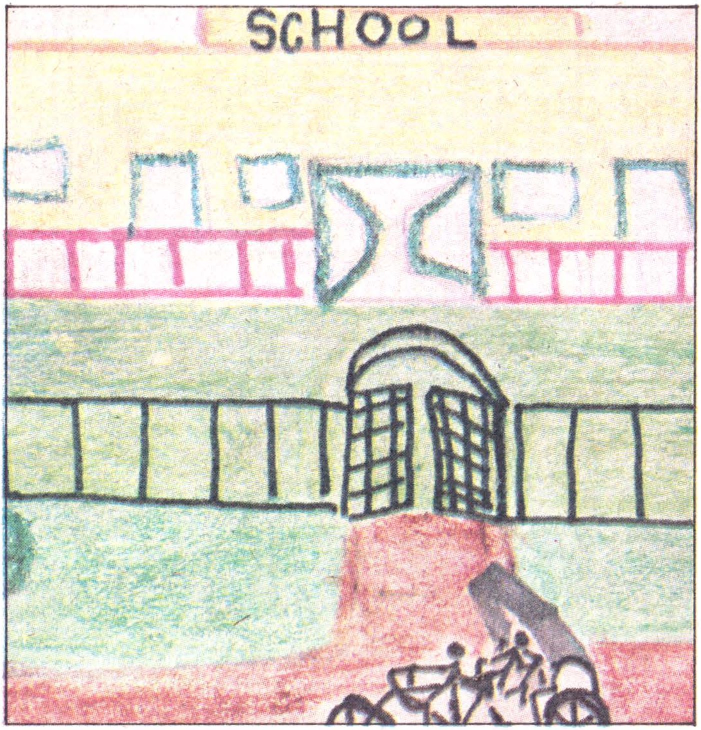

একতলা স্কুল

একদিন আমি আর আমার মা রিকশা করে বেড়াতে যাচ্ছিলাম। যেতে যেতে একটা স্কুল চোখে পড়ল। আমি মাকে বললাম, "মা, সবাই যে বলে এটা হাই-স্কুল, কিন্তু এটা তো দেখছি একটা একতলা স্কুল।"

আমার কথা শুনে মা হো-হো করে হেসে উঠলেন। তারপর আমাকে আদর করে বললেন, "এটা একতলা হলেও হাই-স্কুল। বড়রাও এখানে পড়ে। অনেক উঁচু ক্লাস পর্যন্ত এখানে পড়ানো হয়।"

মা'র কথা শুনে মনে হল, আমি সত্যিই ছেলেমানুষ !

ছবি ও লেখা : সুবর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ৭)

ছবি এঁকেছে সুমনা মল্লিক (বয়স ১০)

ছবি এঁকেছে সুব্রত বিশ্বাস (বয়স ৬)

ভূত নয়, দাদু

একদিন আমি জানলার ধারে বসে আছি। অন্ধকার হয়ে গেছে। জানলার পাশে পুকুর। হঠাৎ দেখি, তিনটে কালো মাথা জলে ভাসছে। আমি ভাবলাম ভূত। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, "মা ভূত!"

চেঁচাতেই শোনা গেল দাদুর গলা। দাদু বললেন, "ওরে ভয় পাস না। আমি ভূত না, দাদু।" দাদু জাল দিয়ে মাছ ধরছিলেন।

ঝুলন গঙ্গোপাধ্যায় (বয়স ৭)

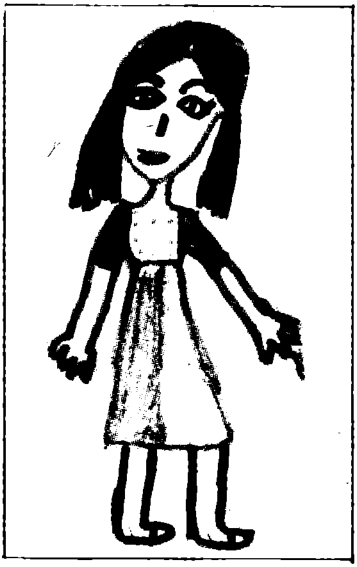

ছবি : রুনা দাশগুপ্ত (বয়স ৬)

এই শীতে

কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায়
এসেছে শীতের বুড়ি
এই আমেজে গরম জামায়
দেব রাতে লেপ মুড়ি
নলেনগুড়ের সন্দেশ আর
পায়েস-পুলি-পিঠে
সকালের রোদ্দুরটা
লাগছে বড় মিঠে
এই শীতেতেই বড়দিন
ময়দানে বই-মেলা
পিকনিক আর হৈ-চৈ
সার্কাসে মজার খেলা

পূর্ণিমা দে (বয়স ৭)

নতুন বই

করেছি পাশ
নতুন ক্লাস
নতুন নতুন বই—
কোন্‌টা ফেলে
কোন্‌টা পড়ি
কোন্‌টা আগে ছুঁই!

অনিতা সাহা (বয়স ১০)

ডাকাতের হাতে

এক যে ছিল পাহারাওলা
নাম ছিল তার হাবু
ডাকাতের হাতে সে
হল ভীষণ কাবু
ডাকাত-ডাকাত বলে হাবু
চেঁচিয়েছিল বেশ
ডাকাতরা তাকে বেঁধে রেখে
হল নিরুদ্দেশ

কৌশিক দে (বয়স ১৩)

টিঙ্কুদাদা আমাকে বাঁচিয়েছিল

আমি একটি টিয়াপাখি। আমার জন্ম এক পাখিওয়ালার খাঁচায়। সেই থেকে আমি পাখিওয়ালার সঙ্গে কত মেলায় যে ঘুরেছি তার ঠিক-ঠিকানা নেই। অনেক মেলায় ঘোরার পরে একজন ক্রেতা আমাকে কিনলেন।

আজ প্রায় দু-বছর হল আমি সেই ক্রেতার বাড়িতেই রয়েছি। এরা সবাই আমায় খু-উ-ব ভালবাসে। আমিও সবাইকে খু-উ-ব ভালবাসি। সবচেয়ে ভালবাসি টিঙ্কুদাদাকে।

টিঙ্কুদাদাকে বোধহয় চিনবে না। সে একটা পোষা কুকুর, এই বাড়িতেই থাকে। প্রথম-প্রথম কিন্তু আমি ওকে মোটেই পাত্তা দিতাম না। উঁচু আংটায় ঝোলানো খাঁচার নীচে দাঁড়িয়ে ও যখন আমার দিকে তাকিয়ে থাকত, আমি তখন মুখ ঘুরিয়ে নিতাম। তারপরে কীভাবে ওর সঙ্গে ভাব হল জানো? শোনো, সেই ঘটনা।

যে ছাদের আংটায় ঝোলানো খাঁচায় আমি থাকি তার পাঁচিলের সঙ্গে প্রায়-লাগোয়া পাশের বাড়ির পাঁচিল। সে বাড়িতে থাকে একটা দুষ্টু ছেলে। সে প্রায়ই পাঁচিলের ওধার থেকে ঢিল ছুঁড়ে আমাকে মারার চেষ্টা করত। একদিন সে পাঁচিল টপকে আমাকে মারতে এল। ভয়ে আমি শিটিয়ে গেলাম। প্রাণপণে চেঁচাবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরোল না। ডানা ঝাপটাতে লাগলাম প্রাণপণে। ছেলেটা আমার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল একটু-একটু করে। হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এল টিঙ্কুদাদা। তেড়ে গেল ছেলেটার দিকে। সে পাঁচিল টপকে পালাল। সেই থেকে টিঙ্কুদাদার সঙ্গে আমার খুব ভাব।

শৈবাল বন্দ্যোপাধ্যায় (বয়স ১৩)

বাঘা

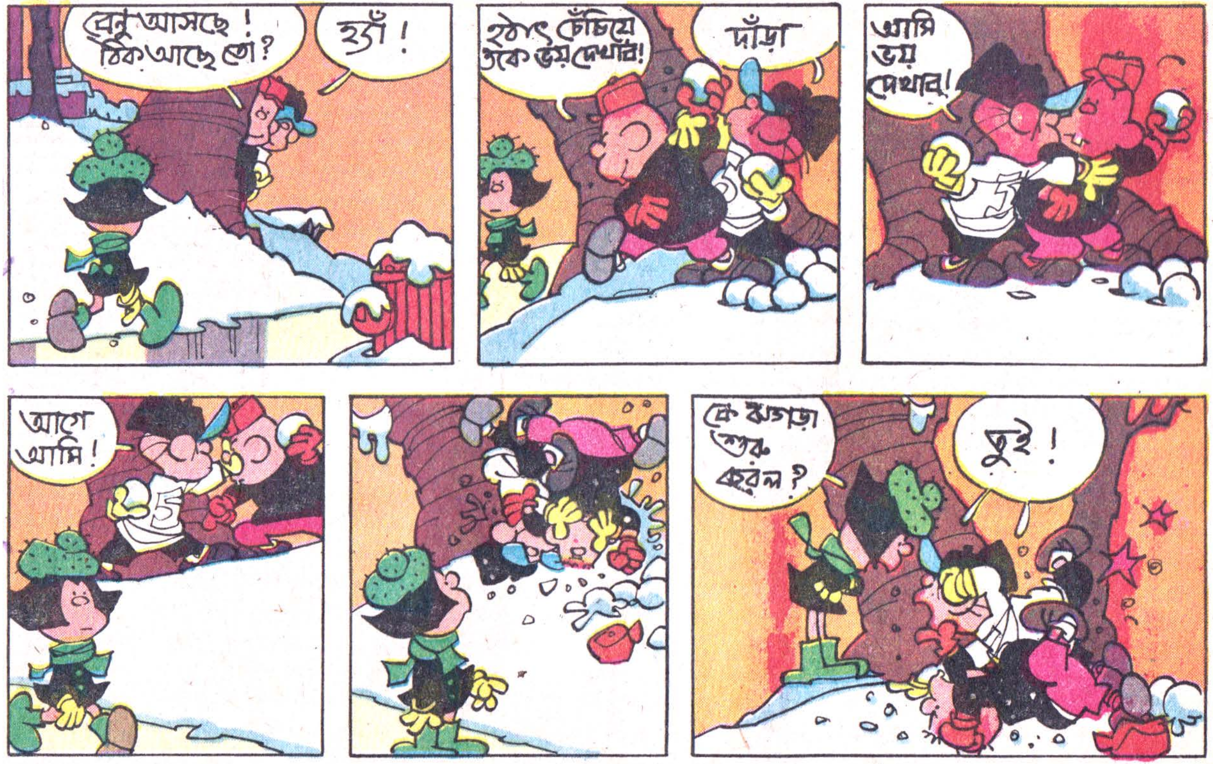

Regd No WBCC/264 MH-By-SOUTH 683
ANAND... March 1983

তাড়াতাড়ি করুন! ব্যাণ্ড-এইড ব্র্যাণ্ড পট্টি লাগান
আপনার বাচ্চাকে সুরক্ষিত রাখার শ্রেষ্ঠ উপায়

ওর এই অনাবৃত ক্ষতে একটুও ধুলোবালি লাগলেও তা দূষিত হয়ে উঠতে পারে

সারা বিশ্বে মায়েরা অনাবৃত ক্ষতকে সংক্রমণের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য **ব্যাণ্ড-এইড** পট্টির ওপর নির্ভর করেন।

ব্যাণ্ড-এইড পট্টিতে আছে একটি প্রমাণিত এনটিসেপটিক যা ক্ষতের উপশমে সাহায্য করে। এর অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রের মধ্য দিয়ে হাওয়া চলাচল করে ব'লে ক্ষতকে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে সারিয়ে তোলে। তাছাড়া এতে আছে বেশী আরামদায়ক অনন্য একটি প্যাড যা চট্‌চট করে না।

ব্যাণ্ড-এইড পট্টি নানা আকারে ও সাইজে পাওয়া যায়। গুরুতর ক্ষত, কাটা-ছ'ড়ে যাওয়া, যেখানে সাধারণত পট্টি লাগানোর অসুবিধে, ফোড়া ও ঘস্টানি — সব ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য। হাতের কাছে **ব্যাণ্ড-এইড** পট্টি রাখুন। সবসময়ে।

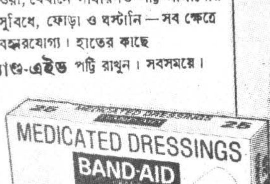

Johnson & Johnson

ব্যাণ্ড-এইড ব্র্যাণ্ড পট্টি
সংক্রমণের হাত থেকে নির্ভরযোগ্যভাবে সুরক্ষিত রাখে

BAND-AID and JOHNSON & JOHNSON are trademarks of JOHNSON & JOHNSON USA © J&J 82

OBM/9283/BN